ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক, কেম্ব্রিজ
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজের পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৩৪৩ সাল.

—তিন টাকা—

এই লেখকের—

দার্শনিকী

কবি-দীপিকা

কাব্য-বিচার

সাহিত্য-পরিচয়

আয়ুর্বেদ

সৌন্দর্যতত্ত্ব

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগজেন্দ্রকুমার
কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ১৮৭-সি আপার সার্কুলার রোড, কলিকা
শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস হইতে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মু

ভূমিকা

ইংরাজী ভাষায় ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে ছোট বড় একাধিক গ্রন্থ লিখিত আছে, কিন্তু বাংলা ভাষায় এই জাতীয় কোনো গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। এইজন্য স্বল্পায়তনের মধ্যে, ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে মোটামুটী ভাবে দুই চারিটী কথায় ভারতীয় দর্শনের ইতিবৃত্ত দেওয়ার চেষ্টা করিলাম। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে যাঁহারা নিপুণভাবে জানিতে চান তাঁহাদের জন্য এ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। কিন্তু এমন অনেকে আছেন যাঁহারা মোটামুটী ভারতীয় দর্শনের কী বক্তব্য তাহা অল্প কথায় জানিতে চান, হয়ত এই গ্রন্থ তাঁহাদের কাজে লাগিতে পারে। বাংলা ভাষায় দার্শনিক গ্রন্থ অতি অল্পই লেখা হইয়াছে, এইজন্য বাংলা ভাষায় দার্শনিক শব্দ গড়িয়া ওঠে নাই। তাহা ছাড়া সংস্কৃত ভাষায় যে সমস্ত পারিভাষিক শব্দ আছে তাহারও দুই চারিটী লোকের জানা প্রয়োজন এইজন্য স্থানে স্থানে দুই চারিটী সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ করিয়া তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা বিস্তৃতভাবে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে জানিতে চাহেন তাঁহারা আমার History of Indian Philosophy পড়িতে পারেন। ইহার তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ।

গ্রন্থকার

ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা

দর্শন—চলতি কথায় দর্শন শব্দটা ইংরাজী Philosophy শব্দের প্রতি-শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পূর্ব্বে এই শব্দটী এই জাতীয় অর্থে ব্যবহার দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। হরিভদ্র সূরির "ষড়্দর্শন সমুচ্চয়" ও মাধবের "সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে" দর্শন শব্দটী অনেকটা Philosophy শব্দের প্রতি-শব্দরূপে নেওয়া হইয়াছে। ইংরাজীতে Philosophy শব্দের বহু অর্থ আছে, তাহার একটী অর্থে জগতের মূল তত্ত্ব ও মূল সত্য অর্থাৎ মানুষের আত্মা, জগৎ, ঈশ্বর, মূল তত্ত্ব-জগতের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া, লয়-প্রক্রিয়া এবং মানব-জীবনের চরম সার্থকতা কোথায়, মানুষের সহিত জগতের ঘটনার সম্পর্ক কি, মানুষের জ্ঞান কেমন করিয়া হয়, আমরা যাহা জানি তা কতটুকু সত্য, কতটুকু মিথ্যা এই সম্বন্ধে নানা আলোচনা, তর্ক ও যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া থাকি। পূর্ব্বতন কালে দর্শন বলিতে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান এবং বুদ্ধির দ্বারা সত্যনিশ্চয় এবং অলৌকিক ভাবে সত্য প্রত্যক্ষ করা এই অর্থেই দর্শন শব্দ ব্যবহৃত হইত। দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মোক্ষলাভের উপায় নির্ণয় করা, এইজন্য ইহাকে "অধ্যাত্মবিদ্যা" বা "মোক্ষশাস্ত্র"

বলা হইত। সাধারণতঃ যে চতুর্দ্দশ বিদ্যার উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে "মোক্ষশাস্ত্র" পরিগণিত হইত না; মোক্ষ-শাস্ত্রের দুই প্রকার উদ্দেশ্য ছিল। একপ্রকার, জগতের নানা তত্ত্ব সম্বন্ধে পরমার্থ সত্য সম্বন্ধে অভ্রান্তভাবে কি জানা যায় তাহা নির্দ্দেশ করা বা তাহা প্রচার করা; দ্বিতীয় প্রকার, কি উপায়ে মানুষ তাহার জীবনে সত্যকে সাক্ষাৎকার করিতে পারে এবং জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন হইতে ত্রাণ পাইতে পারে তাহা নির্দ্দিষ্টরূপে উপদেশ দেওয়া, শাস্ত্রের উদ্দেশ্য পরমার্থ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া এবং বন্ধন হইতে ত্রাণ করা; যাহা বন্ধন হইতে ত্রাণ করে না কিন্তু কেবল নানাবিষয়ের সত্যতা বা অসত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করে তাহাকে "মত" বলা হইত। ভারতীয় দর্শনের ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিতে হয়।

বৈদিক সাহিত্য ও উপনিষদ্—ভারতীয় দর্শনকে "আস্তিক" ও "নাস্তিক" এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যে সমস্ত দর্শন বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে তাহাকে "আস্তিক দর্শন" বলা হয়, আর যে সমস্ত দর্শন বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না তাহাকে লোকে "নাস্তিক দর্শন" বলে; যথা.—চার্ব্বাক. বৌদ্ধ ও জৈন। এই তিনটী দর্শন ছাড়া

ভারতীয় আর সকল দর্শনই বেদের উপদেশকে পরমার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। প্রধানতঃ দুইটী বেদই মৌলিক, "ঋক বেদ" ও "অথর্ব্ব বেদ"। এই দুই বেদ কবিতায় বিরচিত। কয়েকটী কবিতা বা শ্লোক লইয়া একটী বৃহৎ কবিতা রচনা হইয়াছে। প্রত্যেকটী কবিতা বা শ্লোক এবং তদংশকে মন্ত্র বলা হয় এবং তাহাদের সমষ্টিকে "সূক্ত" বলা হয়। ঋক বেদ এবং অথর্ব্ব বেদ ইহারা প্রত্যেকেই কতকগুলি সূক্তের সমষ্টিমাত্র। সেই জন্য ইহাদের অপর নাম "সংহিতা" বা সমষ্টি। ছন্দে লেখা বলিয়া ইহাদের নাম "ছন্দ", ছাত্রেরা গুরুমুখ হইতে শুনিয়া বেদাভ্যাস করিত বলিয়া বেদের অপর নাম "শ্রুতি"। ঋক বেদের যে সূক্তগুলি সুরসংযোগে গান করিতে পারা যাইত সেইগুলিকে একত্র করিয়া যে সূক্ত সমষ্টি বা সংহিতাংশছিল তাহার নাম "সামবেদ" বা "সামসংহিতা"। যে মন্ত্রগুলি প্রধানতঃ যজ্ঞের কাজে লাগে সেইগুলি একত্র হইয়া "যজুর্ব্বেদ" বা "যজুঃসংহিতা" নামে অভিহিত হইত। যজুঃসংহিতাও প্রধানতঃ ঋক বেদ হইতেই সংগৃহীত কিন্তু ইহার মধ্যে কতকগুলি মৌলিক সূক্তও আছে। এই সংহিতা-অংশ ছাড়া আর এক জাতীয় বৈদিক সাহিত্য আছে যাহার নাম "ব্রাহ্মণ"। এই ব্রাহ্মণগুলি

প্রধানতঃ গদ্যে লিখিত। ইহাতে নানা প্রকারের আলোচনা আছে কিন্তু প্রধানতঃ 'কোন্ মন্ত্র কোন্ যজ্ঞে কোন্ অবস্থায় ব্যবহৃত হইবে এবং যজ্ঞ করিবার নানাবিধ নিয়ম পদ্ধতিরও আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাছাড়া বেদের আর একটী বিভাগ আছে, তাহাকে বলা হইত "আরণ্যক"। ঋষিরা যখন বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন তখন বহুব্যয়সাধ্য যাগযজ্ঞ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। 'তখন তাঁহারা নানাবিধ কল্পনার আশ্রয় করিয়া সেই কল্পনাগুলিকে ধ্যান করিতেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ না করিয়া যদি পৃথিবীকে অশ্ব মনে করা যায়, তারাগুলিকে অশ্বের অস্থি মনে করা যায় এবং সেইভাবে ধ্যান করা যায়, তাহা হইলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। আরণ্যকগুলির মধ্যে প্রধানতঃ এই জাতীয় নানা কাল্পনিক ধ্যানের উপদেশ দেওয়া আছে। বেদের চতুর্থ ভাগ বা শেষ ভাগকে "উপনিষদ্" বা "বেদান্ত" বলা হয়। এই উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে এগারটী উপনিষদ্ প্রাচীন বলিয়া সকলে স্বীকার করেন; যথা—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য ও শ্বেতাশ্বতর। ইহা ছাড়া পরবর্ত্তীকালে উপনিষদের প্রণালীতে রচিত অনেক লেখা উপনিষদ্ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

এমনকি মুসলমানদের আক্রমণের পরেও এইজাতীয় লেখা উপনিষদ্ নামে চলিয়াছে। পূর্ব্বে যে এগারখানি উপনিষদের কথা বলা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই ছন্দে রচিত এবং সেগুলিতে যথার্থ ভাবে, পরমার্থ ভাবে কি সত্য এবং আমরা যাহা আমাদের চারিদিকে দেখি তাহার সহিত সেই পরমার্থ সত্যের কি সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধে ঋষিরা আপন আপন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। (উপনিষদের মধ্যে তর্ক যুক্তি প্রণালীতে কোন আলোচনা নাই। কবি যেমন কাব্যের মধ্যে আপন মতকে ব্যক্ত করেন তেমনি করিয়াই ঋষিরা সেই সমস্ত সত্যের আলোচনা করিয়াছেন, যাহা আমাদের চোখের দেখার মধ্য দিয়া ধরিতে পারিনা।) যাহাদের মধ্যে পরমার্থ সত্য এই ভাবে প্রত্যক্ষ দৃষ্টের ন্যায় আবির্ভূত হইত তাহাদিগকেই ঋষি বা কবি এই নাম দেওয়া হইয়াছে। কবি শব্দের অর্থ ক্রান্তদর্শী অর্থাৎ যাঁহার দৃষ্টি চোখের দেখাকে অতিক্রম করে। হৃদয়ের উপলব্ধির দ্বারা যাঁহারা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়া না গিয়া মানুষ প্রত্যক্ষের ন্যায় অভ্রান্তভাবে সত্যের উপলব্ধি করিতে পারে এই বিশ্বাস প্রাচীনদের মধ্যে দৃঢ়মূল হইয়াছিল। (উপনিষদের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া সমস্ত আস্তিক দর্শনে মুখ্যতঃ

বা গৌণতঃ উপনিষদ্ একান্তভাবে অভ্রান্ত ও প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি দেখা যায় যে বিভিন্ন দর্শনে বহু মতভেদ রহিয়াছে। বিভিন্ন মতের লোকেরা সকলেই উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু নিজের নিজের মত সমর্থন করিতে গিয়া উপনিষদের বাক্যকে নিজের নিজের মতের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বেদান্তদর্শন নামে যে দর্শন চলিত আছে তাহার প্রত্যেকটীই মুখ্যভাবে উপনিষদের তাৎপর্য্য বলিয়া বলা হয় অথচ শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভ, নিম্বার্ক প্রভৃতির মধ্যে মতের বহু অনৈক্য রহিয়াছে। ইহারা প্রত্যেকেই উপনিষদের বাক্যগুলিকে আপন আপন মতানুসারে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া, উপনিষদের মত যে তাঁহাদেরই মতের অনুকূল ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং অপরের ব্যাখ্যা যে উপনিষদের যথার্থ ব্যাখ্যা নয় তাহাও প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাকে ইহারা উপনিষদের সারভূত তথ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সেইজন্য ইহাদের অনেকেই গীতারও ব্যাখ্যা নিজ নিজ মতানুসারে করিয়াছেন। উপনিষদের তাৎপর্য্য লইয়া বাদরায়ণ একখানি সূত্রগ্রন্থ লেখেন, সেই গ্রন্থের নাম "ব্রহ্মসূত্র"। বিভিন্ন মতের

বেদান্তীরা এই ব্রহ্মসূত্রের নিজ নিজ মতানুসারে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যার উপরই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রকারের বেদান্ত-দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা অনেকে অন্য মতে বেদান্ত-ব্যাখ্যাকে সমালোচনা করিয়া নানা প্রকারের দোষ দেখাইয়া নিজ নিজ মতের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্র এবং গীতা ঠিক কোন্ সময়ে রচিত তাহা বলা যায় না। উপনিষদ্‌গুলি সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে রচিত হয়। গীতা বোধ হয় উপনিষদের অল্পকাল পরেই রচিত হয় এবং পরবর্ত্তী কালে মহাভারতের মধ্যে তাহা ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। ব্রহ্মসূত্র সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত হয়।

ব্রহ্মসূত্রে চারিটী পাদ আছে এবং প্রত্যেক পাদে চারিটী করিয়া অধ্যায় আছে। এই ষোল অধ্যায়ে ব্রহ্ম-সূত্র সম্পূর্ণ হইয়াছে, সূত্রাকারে লিখিত বলিয়া ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ইহার অধিকাংশ সূত্রেই নানা বিষয়ের উপনিষদের নানা বাক্যের যথার্থ কি তাৎপর্য্য তাহা আলোচনা করা হইয়াছে। এক একটী বিষয়ের আলোচনাকে এক একটী অধিকরণ বলা হয়। কতকগুলি সূত্র লইয়া এক একটী

অধিকরণ। এই সূত্রগুলির মধ্যে কতকগুলিতে যথার্থ তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করা হইয়াছে কিম্বা ভ্রান্ত ব্যাখ্যাকে স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং কতকগুলি সূত্রে সেই সংশয় দূর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দূর করিয়া যথার্থ ব্যাখ্যাটী কি তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের যতগুলি ব্যাখ্যা বা ভাষ্য পাওয়া যায় তাহার মধ্যে খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যই প্রাচীনতম। কিন্তু শঙ্করের ভাষ্য পড়িলে বোঝা যায় যে তাঁহার পূর্ব্বেও ব্রহ্মসূত্রের নানা ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল। শঙ্করাচার্য্য স্থানে স্থানে সেই সমস্ত ব্যাখ্যার ইঙ্গিত করিয়া তাহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। উপনিষদ্‌গুলি কাব্যাকারে লিখিত হইয়াছে বলিয়া তাহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে এত বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার উপনিষদের ভাষ্যগুলিতে, গীতা-ভাষ্যে এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে উপনিষদের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা ফলতঃ এইরূপ— ব্রহ্ম সৎ, চিৎ এবং আনন্দস্বরূপ। সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এই তিনটী বিভিন্ন বস্তু বা বিভিন্ন গুণ নহে কিন্তু এই তিনটীই একই তত্ত্ব বা বস্তু। এই ব্রহ্ম এবং আমাদের

আত্মা একই বস্তু। কাজেই আমরা সাধারণতঃ আত্মা বলিতে যাহা বুঝি, আত্মা তাহা নহে। আত্মা আর আমি এক নহে। আমাদের সমস্ত জ্ঞান আমরা আমিতে আরোপ করি; আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি জানি, আমি জানিনা—এই সমস্ত আমরা যাহা বলিয়া থাকি তাহা একান্ত ভ্রান্ত। আত্মা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ; তেমনি জগতের মূলসত্যও এই আত্মা বা ব্রহ্ম, অথচ তাহাই নানা আকারে, নানা ধর্ম্মে, নানা শক্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছে। পারমার্থিক ভাবে, যে ভাবে ব্রহ্মকে সত্য বলা যায়, সে ভাবে এই সমস্ত, যাহা আমরা দেখিতেছি, শুনিতেছি, ইহাদের কোনো সত্যতা নাই। যাহা দেখা যায়, যাহা প্রতীত হয় অথচ যাহা পূর্ব্বেও ছিল না এখনও নাই এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না তাহাকেই বলা যায় মিথ্যা। যাহা নাই অথচ দেখাও যায় না, কেবল কল্পনা করা যায়, তাহাকে বলা যায় তুচ্ছ, যেমন মানুষের শিং। যাহা প্রতীত হয় অথচ যাহা সত্যভাবে নাই সেইরূপ জ্ঞানকেই বলা যায় ভ্রম। যে ভ্রম আমাদের পরবর্ত্তী সাংসারিক জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয় তাহাকে প্রাতিভাসিক জ্ঞান বলে, যেমন রজ্জুতে সর্প

ভ্রম, বা শুক্তিতে রজত ভ্রম। আর যে ভ্রম ইহকালে কোন জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয় না কেবল ব্রহ্মজ্ঞান হইলে যাহা নিবৃত্ত হয় সেইরূপ জ্ঞানকে ব্যবহারিক জ্ঞান কহে। বৌদ্ধেরা ইহাকে বলিতেন সম্বৃতি সত্য। এই জগতে প্রত্যক্ষের অনুমানে আমরা যাহা পাই, যাহা সত্য বলিয়া মনে করি সে সমস্তই ব্যবহারিক জ্ঞান, ব্যবহারিক সত্য অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবন চালাইবার পক্ষে সত্য কিন্তু সেগুলি পারমার্থিক ভাবে সত্য নয়, কারণ যখন ব্রহ্মজ্ঞান উদ্ভাসিত হইবে বা ব্রহ্মস্বরূপ উদ্ভাসিত হইবে তখন এই সমস্ত কোনো সাংসারিক জ্ঞানই থাকিবেনা এবং পুনরায় আর আসিবে না। পরমার্থ সত্যের যে ইহাই স্বরূপ তাহা যুক্তি তর্কে বুঝাইবার কথা নহে, তাহা উপনিষদ্ যে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছে সেই বর্ণনার প্রামাণ্যে আমাদের মানিয়া লইতে হইবে। ব্রহ্ম কী এবং ব্রহ্মের স্বরূপ কী, শঙ্করাচার্য্য তাহা যুক্তির প্রমাণের দ্বারা স্থাপন করেন নাই। উপনিষদের প্রামাণ্যেই তাহা মানিয়া লইয়াছেন। উপনিষদের উপর শ্রদ্ধা রাখিয়া যদি আমরা অবিচারিত ভাবে মানিয়া লই যে এইরূপ নির্গুণ জ্ঞানস্বরূপ, সৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ তত্ত্বই ব্রহ্ম তবে স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠে যে তবে এই যে নানা রূপ, বিচিত্র আকার, বিচিত্র নিয়ম আমরা প্রতিনিয়ত

আমাদের চারিদিকে দেখিতেছি ইহা আসিল কোথা হইতে? ইহার উত্তরে শঙ্কর বলেন যে ব্রহ্মের স্বরূপ কী, পরমার্থে সত্যের স্বরূপ কী তাহা যখন আমরা উপনিষদের প্রামাণ্যে জানি তখন বাদবাকী যাহা কিছু আমাদের কাছে প্রতিভাত হইতেছে তাহা সমস্তই মায়া—অর্থাৎ মিথ্যা, অর্থাৎ তাহা কেবল মাত্র প্রতিভাত হয় কিন্তু তাহা অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতে কোন সময়েই ছিল না, নাই এবং থাকিবে না। একটী দড়ি যখন অল্প আলোকে আমাদের কাছে সাপ বলিয়া মনে হয় তখন সেই সাপ দেখিয়া আমরা ভয় পাইতে পারি, লাঠি দিয়া দড়িটীর উপর আঘাত করিতে পারি তথাপি ইহা বলিতে পারি না যে আমরা যে সাপ দেখিয়াছিলাম সেই সাপ সেখানে কোনো সময় ছিল, সকল সময়েই সেখানে ছিল কেবল মাত্র একটী দড়ি। তেমনি এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এই যে আমরা আত্মাকে আমি বলিয়া মনে করি এবং এই যে আমরা আত্মার উপর কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের আরোপ করি তাহা এই রকমই একটা মিথ্যা প্রকৃতি, তাহাদের মূলে যে চিরন্তন সত্যটী রহিয়াছে তাহা ব্রহ্ম। রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ও ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রম এই উভয়েই একজাতীয় ভ্রম, উভয়ের মধ্যে কেবলমাত্র এই পার্থক্য যে জগৎ-ভ্রম মুক্তি হওয়া পর্য্যন্ত সমান ভাবেই চলিবে কিন্তু

রজ্জুতে সর্পভ্রম বা নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নদর্শন অল্পকাল থাকিয়াই কাটিয়া যায় এইজন্য এইগুলিকে প্রাতিভাসিক বলে এবং জগৎ-ভ্রমকে ব্যবহারিক বলে। যে পর্য্যন্ত জগৎ-ভ্রম থাকে অর্থাৎ মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, জগতের যাহা কিছু প্রমাণের দ্বারা সত্য বলিয়া নির্ণীত তাহা আমাদের মানিয়া লইতে হইবে। বিধি নিষেধ, পাপ পূণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, জন্ম মৃত্যু, ইহকাল পরকাল, কর্ম্মফল, জন্মান্তর, আমাদের আমির কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব, আমি ও তুমির ভেদ বা আমার সঙ্গে জগতের ভেদ, জগতের নানারূপ কার্য্যপ্রণালী ও নিয়মপদ্ধতি সমস্তই মিথ্যা হইয়াও যথার্থ। আমরা যে স্বপ্ন দেখি তাহাও স্বপ্নকালে সত্য বলিয়া মনে হয় এবং তাহারও একটী স্বাপ্নিক যথার্থতা আছে; এই হিসাবে জগতেরও একটী ব্যবহারিক যথার্থতা আছে। এইজন্য ব্যবহারিক জীবনে এই জগতের সমস্ত নিয়ম ও শাস্ত্রের বিধিনিষেধ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য। সর্ব্বলোকের মুক্তি না হইলে এই জগৎ-ভ্রম সকলের পক্ষে যাইতে পারে না। কোনো বিশেষ ব্যক্তির মুক্তি হইলে তাহার পক্ষে জগৎ-ভ্রম শেষ হইতে পারে কিন্তু তাহার পক্ষেও যতক্ষণ এই দেহ থাকে ততক্ষণ এই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত জগতের নানা বিক্ষোভ, নানা জ্ঞান বন্ধ হইবে

না। তিনি মনে হয়ত নিশ্চয় জানেন যে যাহা কিছু দেখিতেছেন তাহা সমস্তই মিথ্যা, তথাপি দাঁতের বেদনা হইলে তাহা তিনি অনুভব করিবেন, তবে সেই বেদনাকে মিথ্যা জানেন বলিয়া তাহার তীব্রতা তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না। এই অবস্থার নাম জীবন্মুক্তি। পরবর্তী কালে মায়ার স্বরূপ কী, মায়া কি হিসাবে অজ্ঞান বা অবিদ্যা এবং মায়ার সহিত ব্রহ্মের সম্পর্ক কী ইহা লইয়া নানা যুক্তি তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন মতের বিভিন্ন বেদান্তী-দের মধ্যে নানা তর্ক উঠিয়াছে। কিন্তু কেহই মায়ার সহিত সম্পর্কে এই জগৎ নানারূপে ও নানা নামে, নানা নির্দিষ্ট নিয়মে ও পদ্ধতিতে কি ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, কি ভাবে প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে, কি ভাবে প্রাণের নানা লীলা নানাবিধ দেহযন্ত্রকে সৃষ্টি করিয়াছে সে বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান বা আলোচনা করেন নাই। অদ্বৈত-বেদান্তের মূল কথা হইল এই, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, অবিদ্যা, অজ্ঞান বা মায়ার দ্বারা ব্রহ্মের সত্যস্বরূপ আবৃত বা আচ্ছন্ন হয় এবং সেই ব্রহ্মসত্তার উপর নানা প্রকারের কাল্পনিক বস্তুপ্রক্রিয়ার আবির্ভাব হইয়া এই জগৎ-রূপে অজ্ঞানাবৃত জীবের নিকট প্রতিভাত হয়। আমি বলিতে বা জীব বলিতে যাহা বুঝি, তাহাও এইরূপ

একটা মিথ্যা সৃষ্টি, তাহার অন্তরে রহিয়াছে আত্মা বা ব্রহ্ম। সেই আত্মা বা ব্রহ্ম এবং জগতের মূলে যে সত্য রহিয়াছে তাহা একই বস্তু,—অখণ্ড, অদ্বৈত। বাহিরের দিকে মায়ার খেলায় যেমন এই জগতের একটা মিথ্যা সৃষ্টি হইয়াছে তেমনি আমাদের অন্তর্লোকেও নানারূপ জ্ঞানে, ইচ্ছায় ও সুখ দুঃখ প্রভৃতির অনুভবে জাগ্রদ্দশায় ও স্বপ্নে নানারূপ অবিদ্যার ছলনাময়ী সৃষ্টি চলিয়াছে কেবল স্বপ্নহীন গভীর সুষুপ্তিতে অর্থাৎ যখন কোনো বিষয়ের জ্ঞান থাকে না অথচ একটা আনন্দময় চৈতন্য থাকে তখনই অজ্ঞানের মধ্য দিয়া ব্রহ্মসত্তা আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। যখন আমাদের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মল হয় এবং নিশ্চল ও শান্ত হয়, বিষয়ের সমস্ত লোভ যখন থামিয়া যায় তখনই যথার্থভাবে আমরা উপনিষদ্ পাঠের যোগ্য হই। সেই সময়ে যখন গুরু আমাদের বলেন তুমিই সেই পরম তত্ত্ব তখন একনিমেষে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্ব আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতে পারে। একবার এইভাবে ব্রহ্মতত্ত্ব আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হইলে সমস্ত জগৎ-ভ্রম একই সঙ্গে চিরকালের জন্য নিবৃত্ত হয়। মায়া কী, অবিদ্যা কী, অজ্ঞান কী তাহা বেদান্তীরা স্পষ্ট করিয়া

বলিতে পারেন না। মায়া, অবিদ্যা ও অজ্ঞান অর্থ যাহা জানি না অথচ যাহা নানা অনর্থ ভ্রমের উৎপত্তি করিতে পারে তাহাই। এই জন্য মায়াকে সৎও বলা যায় না অসৎও বলা যায় না। মায়া অনির্ব্বচনীয়। ভ্রমের কোনো তত্ত্ববিচার হয় না। Othelo, Desdemonaকে অসতী মনে করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিলেন এই ভ্রান্ত প্রকৃতির মূলতত্ত্ব কী তাহা বলা যায় না অথচ ইহা একটা কিছু বটে। ইহা সত্যও নয় অসত্যও নয়। একান্ত অসত্য হইলে ইহা একটা খুন ঘটাইতে পারিত না, আবার ইহাকে সত্যও বলা যায় না। এইজন্য মায়াকে বা অবিদ্যাকে ভাব-রূপ বা positive বলা হয়, কিন্তু ইহাকে সত্য বা অসত্য এই কোনোরূপ তত্ত্বের মধ্যেই ফেলা যায় না। শঙ্করাচার্য্য বলেন যে এই ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফুরণের জন্য কোনো প্রকার যাগ-যজ্ঞ, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম, গ্রহণ প্রভৃতিতে স্নান, দান প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্ম কিম্বা নানা পূজা-অর্চ্চনাদি কাম্য-কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা বেদের বিধিনিষেধাদি মানিয়া চলিবেন তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী নন। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে চান তাঁহাদের সেই সঙ্গে বিধিনিষেধাদি নানাজাতীয় কর্ম্মের করা চলে না। জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই যে একসঙ্গে

চালান যায় না এই কথাই শঙ্করাচার্য্য তাঁহার গীতাভাষ্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

বহু শিষ্য ও প্রশিষ্যের দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত দার্শনিক মত বা উপনিষদের ব্যাখ্যা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য গিরি, পুরী, ভারতী, বন, অরণ্য প্রভৃতি দশটী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাস-আশ্রম প্রবর্ত্তিত করেন, এবং চারটী প্রধান মঠ স্থাপন করেন। এইজন্য তাঁহার মত সর্ব্ব ভারতে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। বাচস্পতি মিশ্র নবম শতকে শঙ্করের ভাষ্যের উপর ভামতী নামক টীকা লেখেন। এই টীকার টীকা কল্পতরু, তাহার টীকা পরিমল, তাহার টীকা আভোগ; আবার শঙ্কর-শিষ্য পদ্মপাদাচার্য্য প্রথম চারিটী সূত্রের তদ্‌রচিত ভাষ্যের উপর পঞ্চ-পাদিকা নামক টীকা লেখেন। এই পঞ্চ-পাদিকার উপর প্রকাশাত্ম লেখেন তাঁর বিবরণ-টীকা। এই বিবরণের উপর বিবরণোপন্যাস, বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ লেখা হয়। খৃষ্টীয় দশম শতকে সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি শঙ্কর-ভাষ্যের তাৎপর্য্য লইয়া লেখেন সংক্ষেপশারীর। মণ্ডপাচার্য্য লেখেন তাঁহার ব্রহ্মসিদ্ধি। সুরেশ্বর লেখেন তাঁহার বার্ত্তিক। এই দুইজনই শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন,

ইহা ছাড়া শঙ্করমতের নানা বিচার্য্য বিষয় লইয়া অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। শ্রীহর্ষ একাদশ শতকে বেদান্তের পক্ষ হইতে ন্যায়মত খণ্ডন করিতে গিয়া তাঁহার খণ্ডনখণ্ডখাদ্য নামক একখানি তর্কগ্রন্থ লেখেন। ত্রয়োদশ শতকে চিৎসুকাচার্য্যও ওইরূপ একখানি গ্রন্থ লেখেন। ওই ত্রয়োদশ শতকে প্রকটার্থ-বিবরণ নামে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের উপর একখানি প্রসিদ্ধ টীকা গ্রন্থ রচিত হয়। ওই শতকেই বিমুক্তাত্ম লেখেন তাঁহার ইষ্টসিদ্ধি। চতুর্দ্দশ শতকে রামাদ্বয় লেখেন বেদান্ত-কৌমুদী। এই বেদান্ত-কৌমুদীকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র লেখেন বেদান্ত-পরিভাষা; ইহাতে বেদান্তমতের প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি স্বরূপ আলোচনা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। চতুর্দ্দশ শতকে বিদ্যারণ্য লেখেন বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহ, পঞ্চদশী ও জীবন্মুক্তিবিবেক, ষোড়শ শতাব্দীতে নৃসিংহাশ্রম মুনি, অপ্পয়দীক্ষিত ও প্রকাশানন্দ প্রভৃতি শঙ্কর-বেদান্ত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লেখেন। মধ্বমতানুবর্ত্তী ব্যাসতীর্থ তাঁহার ন্যায়ামৃত গ্রন্থে শঙ্কর-বেদান্তের যে তীব্র সমালোচনা করেন মধুসূদন সরস্বতী ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁহার অদ্বৈত-সিদ্ধি গ্রন্থে তাহার উত্তর দেন। এই সমস্ত অতি প্রসিদ্ধ লোক ছাড়াও বহু প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ লোকেরা অদ্বৈত মতের

উপর বহু শতাব্দী ধরিয়া নানা গ্রন্থ লিখিয়া আসিয়াছেন এবং এখনও এই বিষয়ে নানা গ্রন্থ ইংরাজী এবং সংস্কৃতে লেখা চলিতেছে। এ সম্বন্ধে আমার History of Indian Philosophy, দ্বিতীয় খণ্ডে বহু তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

রামানুজ—শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বকাল হইতেই বেদান্তের একটী ব্যাখ্যা চলিয়া আসিতেছিল। ভর্তৃপ্রপঞ্চ প্রভৃতিরা এই ব্যাখ্যা সুরু করেন। বোধায়ন-বৃত্তিতেও এই প্রণালীর ব্যাখ্যাই অনুসৃত হয়। ভাস্কর খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে কোনো সময়ে ব্রহ্মসূত্রের এই প্রণালীতে একটী ভাষ্য লেখেন। সাধারণ ভাবে এই মতটীকে ভেদাভেদবাদ বলা যায় অর্থাৎ সাগর তাহার তরঙ্গ, ফেনা প্রভৃতি হইতে ভিন্নও বটে ভিন্ন নয়ও বটে, সেই রকম ব্রহ্ম জগৎ হইতে ভিন্নও বটেন ভিন্ন নয়ও বটেন। এই মতের মধ্যে নানাপ্রকারের বৈষম্য থাকিলেও একটা ঐক্য আছে এবং অদ্বৈত-মত হইতে ইহা পৃথক। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে গেলে মনে হয় যে ইহাই বোধ হয় ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য। উপনিষদ্-গুলির মধ্যে কোথাও বা অদ্বৈত মতটী স্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও বা ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে যে একটী ভেদ আছে তাহাও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই দুইটী

মতকে একত্র লইতে গেলে ভেদাভেদবাদেই দাঁড়াইতে হয়। রামানুজ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বোধায়ন-বৃত্তিকে অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের উপর একটী ভাষ্য লেখেন। এই ভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য। পঞ্চরাত্র-আগম আড়োয়াড়দের দ্বারা তামিল ভাষায় বিরচিত নানা ভক্তিমূলক কাব্য-গ্রন্থ ও যামুনাচার্য্যের সিদ্ধিত্রয় হইতে রামানুজ তাঁহার মত গড়িয়া তোলেন এবং ব্রহ্মসূত্রের উপর লিখিত বোধায়ন-বৃত্তিকে অনুসরণ করিয়া তাঁহার শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করেন। তাঁহার মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা হয়। তাঁহার প্রধান বক্তব্য এই যে ব্রহ্ম নির্গুণ নন। ব্রহ্ম ঈশ্বর এবং তাঁহার গুণাবলী অসংখ্য। এই জড়-জগৎ ও আমাদের আত্মা এই উভয়েই ঈশ্বরের অংশ। আমাদের যেমন শরীরের সমস্ত কার্য্যের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে, ঈশ্বরেরও তেমনি আমাদের আত্মা বা জীবস্বরূপের সমস্ত কার্য্যের উপর এবং জগতের সমস্ত ঘটনার উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে। জীব ও জগৎ এই উভয়েই যেন ঈশ্বরের শরীর বা অংশ, ব্রহ্ম যে একান্ত নির্ব্বিশেষ, জ্ঞান আনন্দ প্রভৃতি যে ব্রহ্মের কোনো গুণ নয়, শঙ্করের এই মতটীকে রামানুজ অত্যন্ত তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঈশ্বরকে কোনো

প্রমাণের দ্বারা স্থাপনা করা যায় না। কেবল শাস্ত্র-বাক্যে শ্রদ্ধা দ্বারা তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে হয়। বেদোক্ত নানাবিধ নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের দ্বারা আমাদের চিত্তকে সর্ব্বদা বিশুদ্ধ করিয়া তোলা আমাদের কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবে চিত্তকে বিশুদ্ধ করিবার পর আমরা যদি ভগবানের উপর একান্তভাবে শরণাপন্ন হই তাহা হইলে এই শরণাগতি বা প্রপত্তির ফলে ভগবান প্রসন্ন হইয়া আমাদের মুক্ত করিয়া দেন। তখন আমরা তাঁহার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া নিরন্তর তাঁহার সন্নিধিলাভ করি এবং জন্মমৃত্যুর দায় হইতে মুক্তি পাই। নিরন্তর প্রীতি-পূর্ব্বক ভগবানের ধ্যান করাই ভক্তি। এই ভক্তি ও শরণাগতিই আমাদের মুক্তির একমাত্র উপায়। যতদূর মনে হয় আড়োয়াড়েরাই ভক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন, গীতাতেও ভক্তির কথা পাওয়া যায় বটে কিন্তু আড়োয়াড়দের মধ্যে প্রেমের দিকটা যেমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তেমন ভাবে গীতাতেও পাওয়া যায় না। শঙ্কর যেমন বলিয়াছেন যে আমাদের সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, রামানুজ তেমনই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে আমাদের সমস্ত জ্ঞানই সত্য। রামানুজ শঙ্করের অবিদ্যা-বাদকে বিশেষভাবে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

জগৎ সম্বন্ধে রামানুজের মত অনেকখানি পরিমাণে সাংখ্যমতের অনুবর্ত্তী। এই সাংখ্যমতের কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। রামানুজের ভাষ্য এবং অন্যান্য-গ্রন্থের উপর বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা বহু গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। রামানুজের ভাষ্যের উপর প্রথম টীকা শ্রীভাষ্য-বিবৃতি। দ্বিতীয় টীকা সুদর্শন-সূরি-কৃত শ্রুত-প্রকাশিকা। এই শ্রুত-প্রকাশিকার উপর লেখা হয় ভাব-প্রকাশিকা। ইহার উপর লেখা হয় ভাষ্য-প্রকাশিকা দূষণদ্বার। শ্রুত-প্রকাশিকার উপর আর একটী টীকা লেখা হয় তাহার নাম তূলিকা। এইরূপ ভাবে রামানুজ-ভাষ্যের উপর বহু টীকা ও টীকার উপর টীকা ও তাহার বিষয়বস্তু লইয়া স্বতন্ত্র ভাবে বহু আলোচনা হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমার History of Indian Philsophyর তৃতীয় খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে। রামানুজ-সম্প্রদায়ের মধ্যে চতুর্দ্দশ শতকে বেঙ্কটনাথ বহু গ্রন্থ লিখিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইনি রামানুজ-মত সমর্থন করিয়া নানাপ্রকারে নানা তর্ক ও যুক্তি দেখাইয়া রামানুজ-মতকে অত্যন্ত দৃঢ় করিয়া গিয়াছেন। রামানুজ-মতের উপরও বহু প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ লোকেরা বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং রামানুজ-মতের উপর এখনও পর্য্যন্ত নানা

গ্রন্থ লেখা চলিতেছে। কিন্তু মেঘনাদারি, বাদিহংসনবাম্বুদ, মহাচার্য্য, লোকাচার্য্য, সৌম্য-জামাতৃ মুনি, কস্তুরীরঙ্গাচার্য্য, শৈল-শ্রীনিবাস, ও রঙ্গাচার্য্য প্রভৃতিরা অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহাদের অনেকের গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হয় নাই। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর দিক হইতে ভক্তি-বাদই প্রধান ভাবে অনেকের আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিষয়ে লোকাচার্য্যের শ্রীবচনভূষণ গ্রন্থখানি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। গ্রন্থখানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

মধ্ব—রামানুজের কিছু পরেই মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর চতুর্থভাগ পর্য্যন্ত (১১৯৯-১২৭৮) মধ্বাচার্য্যের জীবিত-কাল। তিনি সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদের দ্বৈতমতে ব্যাখ্যা করেন। মধ্বাচার্য্যের মতে ইহাই উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য যে, ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন, প্রত্যেক জীব অন্য জীব হইতে ভিন্ন ; জীব ও জগৎ ভিন্ন ; জগৎ এবং ব্রহ্ম ভিন্ন এবং জগতের প্রত্যেক বস্তু বিভিন্ন। জাগতিক পদার্থগুলি মধ্ব অনেকটা ন্যায়-বৈশেষিকের মতানুসারে বিভাগ করিয়াছেন; দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, বিশিষ্ট, অংশী, শক্তি, সাদৃশ্য এবং অভাব এইগুলি ছিল মধ্বের মূল পদার্থ। জগৎকে তিনি পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া

মানিতেন এবং জাগতিক পদার্থ ও জীবের সত্যতা তিনি মানিতেন, অবিদ্যার দ্বারা ও অজ্ঞানের দ্বারা একই ব্রহ্ম জগৎপ্রপঞ্চরূপে ভ্রান্তভাবে প্রতিভাত হইতেছে একথা মধ্ব মানিতেন না; এইজন্য মধ্ব এবং মধ্বের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশ-স্থলেই তাঁহারা শঙ্করের অদ্বৈত-মত, তাঁহার মায়াবাদ, ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্যবাদ খণ্ডন করিতে প্রচুর তর্ক ও যুক্তি দেখাইয়াছেন। সংস্কৃত দর্শনের ইতিহাসে এইরূপ কূটতর্ক ও সূক্ষ্ম যুক্তি অতি বিরল। মুক্তিতে জীবের জীবত্ব খণ্ডিত হইয়া জীবের ব্রহ্মস্বভাব উদ্ভাসিত হয় একথা মধ্ব মানিতেন না। তাহা ছাড়া মুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও পরস্পর ভেদ আছে এবং শ্রেণীবিভাগ আছে ইহাও মাধ্বেরা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মধ্ব নিজে বহু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; উপনিষদ্‌গুলির ভাষ্য করিয়াছিলেন; মহাভারত ভগবদ্গীতা ও ভাগবতের উপর গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন; বেদান্তসূত্রের উপর চারিখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া আরও বহু গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছিলেন। সর্ব্বসাকল্যে মধ্ব নিজেই প্রায় পঁয়ত্রিশখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। মধ্বের শিষ্য ও প্রশিষ্যেরাও বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে জয়তীর্থ এবং ব্যাসতীর্থ সর্ব্বপ্রধান। জয়তীর্থের ন্যায় সুধামাধ্বের

সম্প্রদায়ের লোকেরা এখনও ধর্ম্মগ্রন্থস্বরূপ প্রাতঃকালে পাঠ করিয়া থাকেন। জয়তীর্থ ও ব্যাসতীর্থ উভয়েই শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে প্রবলভাবে আক্রমণ করেন। ব্যাসতীর্থের ন্যায়ামৃত খণ্ডন করিতে গিয়াই মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ লেখেন। পরবর্ত্তী কালে এই দুই গ্রন্থের টীকাকারেরা আবার দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের লড়াই চালাইতে থাকেন, এমনি করিয়া মধ্বসম্প্রদায়ের লোকেরা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহাদের দ্বৈতবাদ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং এখন এ বিষয়ে ইংরাজীতে এবং সংস্কৃতে গ্রন্থ লেখা চলিতেছে। ব্যাসতীর্থ ন্যায়শাস্ত্রে এত তীক্ষ্ণধী ছিলেন যে তাঁহার তর্কতাণ্ডব গ্রন্থে তিনি গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণিতে যে সমস্ত বিষয়ের লক্ষণ ও আলোচনা ছিল তাহা অতি তীব্রভাবে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এমনি করিয়া মধ্ব ও মধ্বশিষ্যেরা একটা নূতন সম্প্রদায়ের তর্কশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে তর্কতাণ্ডব গ্রন্থে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ অংশ ছাপা হইয়াছে কিন্তু অনুমান সম্বন্ধে এই বিরাট গ্রন্থ এখনও ছাপা হয় নাই। দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া মধ্ব ও মধ্বশিষ্যেরা ভক্তিবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া গিয়াছেন। অদ্বৈতবাদে ভক্তির কোন স্থান নাই; সেখানে ঈশ্বরও মায়ার মিথ্যা

সৃষ্টি, কেবলমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য, জীবও জীবস্বরূপে মায়ার মিথ্যা সৃষ্টি। সৎস্বরূপে, চৈতন্যস্বরূপে জীবও যেমন ব্রহ্ম ঈশ্বরও তেমনি ব্রহ্মস্বরূপ। তাঁহার ঐশ্বরিকতা-অংশ মায়ার মিথ্যা সৃষ্টি, কাজেই এমতে ভক্তির কোনো দার্শনিক ভিত্তি নাই। মধ্ব-মতে ঈশ্বর ও জীব সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং ঈশ্বরের কৃপাই মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায়।

নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য ছিলেন একজন তৈলেঙ্গ ব্রাহ্মণ। তিনি ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যদের তেত্রিশটী বংশ চলিয়া গিয়াছে। নিম্বার্ক ব্রহ্মসূত্রের একটী ভাষ্য লেখেন, তাহার নাম বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ। ইহার উপর শ্রীনিবাস যে টীকা লেখেন তাহার নাম বেদান্ত-কৌস্তুভ। ইহার উপর কেশব কাশ্মীরি ভট্ট যে টীকা লেখেন তাহার নাম বেদান্ত-কৌস্তুভ-প্রভা। ইহা ছাড়া কেশব কাশ্মীরি ভগবদগীতার উপর এবং ভাগবতের দশম স্কন্ধের উপর এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদের উপর টীকা লিখিয়াছিলেন। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা নিম্বার্কের মত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। মাধবমুকুন্দ পরপক্ষ-গিরিবজ্র গ্রন্থে শঙ্কর-মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন। নিম্বার্ক-মতে ইহাই

প্রধান তর্কগ্রন্থ। এই নিম্বার্কের সম্প্রদায় আজও প্রবলভাবেই চলিয়াছে এবং এই বাংলা দেশেও অনেকে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মত অবলম্বন করেন। নিম্বার্ক বলেন যে বেদের কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া লোক যখন দেখে যে কর্ম্মের দ্বারা কোনো স্থায়ী ফল লাভ করা যায় না তখনই ব্রহ্মজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সকলের আদি কারণ। কেবলমাত্র ভক্তি ও ব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের ধ্যানের দ্বারা ও ভক্তির দ্বারা ব্রহ্মলাভ হইতে পারে। নিম্বার্কের মত ভেদাভেদবাদেরই অন্তর্গত। ব্রহ্মই আপনাকে জগৎ-রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, জগৎ ব্রহ্মের সহিত ভিন্নও বটেন অভিন্নও বটেন। মাকড়সা যেমন নিজের মধ্য হইতে জাল সৃষ্টি করে এবং তাহার মধ্যস্থলে উদাসীন ভাবে বসিয়া থাকে, ব্রহ্মও তেমনি নিজের মধ্য হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নিজে স্বতন্ত্র এবং উদাসীন ভাবে তাহার কর্ত্তারূপে রহিয়াছেন। একান্ত অদ্বৈতমত ও একান্ত দ্বৈতমত উভয়েই ভ্রান্ত। নিম্বার্ক শঙ্করের অদ্বৈত-মতের একান্ত বিরুদ্ধ। ব্রহ্ম নির্গুণ নন, তিনি সমস্ত কল্যাণগুণের আশ্রয়; ব্রহ্ম যদি জ্ঞানস্বরূপ হন তবে তিনি অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না। এইজন্য

অজ্ঞানকে জগৎসৃষ্টির কারণ-রূপে বলিয়া স্বীকার করা যায় না; এইজন্য জগৎ-প্রপঞ্চকে মিথ্যাও বলা যায় না। এইভাবে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের লোকেরা শঙ্করের মায়াবাদের উপর নানা তীব্র সমালোচনা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মধ্বসম্প্রদায়ের অদ্বৈত-বেদান্তের বিরুদ্ধে যে সমস্ত তর্কযুক্তি আছে তাহা আমার History of Indian Philsophyর মুদ্রমাণ চতুর্থখণ্ডে পাওয়া যাইবে। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের তর্কযুক্তি আমার ওই গ্রন্থেরই তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্বার্কের মতে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ হইলেও ইহা জ্ঞাতাও বটে। সূর্য্য যেমন আলোকময় তেমনি তিনি আলোকের জনক। নিম্বার্ক-মতে আমাদের আত্মাগুলি অসংখ্য এবং পরস্পর ভিন্ন। জীব তার কর্ম্মফলে নানা জন্ম লাভ করিয়া সংসার-চক্রে ঘুরিতে থাকে কিন্তু ঈশ্বর কর্ম্মের নিয়মে আবদ্ধ নন। তিনি অনুগ্রহ করিলে মানুষের কর্ম্মবন্ধন ছেদ করিতে পারেন। জীব ঈশ্বরের অংশ, তাই জীবের মধ্যে যে সমস্ত অনুভব, জ্ঞান প্রভৃতি চলিয়াছে ঈশ্বর তাহা আপন শরীরের মধ্যে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ভাস্করের মত ভেদাভেদবাদ হইলেও অভেদের উপরই তাঁহার জোর ছিল। নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতমতে ভেদের উপরই প্রধান

দৃষ্টি। জীব যদিও ভগবানের সহিত অভিন্ন তথাপি সে ভগবান হইতে ভিন্ন। কিন্তু জীব যখন ভগবান হইতে আপনাকে একান্তভাবে স্বতন্ত্র মনে করে তখনই ঘটে তার বন্ধন। জীব যখন সর্ব্ব কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া গভীর ভক্তিতে মনে করে যে তাহার সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা শ্রীভগবান, তখনই সে মুক্তিলাভ করে; কিন্তু মুক্তির আনন্দে সে যখন পূর্ণ তখনও সে ভগবানের সহিত একান্তভাবে এক হইয়া যায় না। শঙ্কর যেমন জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় মানেন নাই, রামানুজ, মধ্ব এবং নিম্বার্কও তেমনি জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয় মানেন নাই। শাস্ত্রবিহিত বিধিনিষেধের পালনের দ্বারা আমরা ভক্তিমার্গের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি। শঙ্কর-মতাবলম্বীরা জগৎকে অসত্য মনে করেন কিন্তু নিম্বার্ক-মতাবলম্বীরা জগৎ ব্রহ্মের বিকাশ বলিয়া জগৎকে সত্য বলিয়াই মনে করেন।

বল্লভাচার্য্য—বল্লভাচার্য্য ১৪৮১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩৩ খৃঃ দেহরক্ষা করেন। তিনি ছিলেন একজন তেলেগু ব্রাহ্মণ। বল্লভাচার্য্য প্রায় চুরাশীখানি ছোট ছোট গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। বল্লভের পুত্র (১৫১৮—১৫৮৮) বিট্ঠলদীক্ষিতও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বিট্ঠলের পুত্র পীতাম্বরও বহুগ্রন্থের রচয়িতা। ইহা ছাড়া মুরলীধর,

ঘনশ্যাম, গোকুলনাথ প্রভৃতি বল্লভ-সম্প্রদায়ের প্রধান শিষ্যেরা বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে বল্লভাচার্য্য বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন। বিষ্ণু-স্বামীর কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। বল্লভাচার্য্যের মতকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলা হয়। বল্লভাচার্য্যের মতকেও একরূপ ভেদাভেদবাদ বলিয়াই বলা যাইতে পারে। বল্লভ বলেন যে, সর্প যেমন কুণ্ডলি পাকাইয়া থাকিলেও সর্প এবং বিস্তৃত হইয়া থাকিলেও সর্প, তেমনি এই জগদাকারে বিস্তৃত হইয়া যাহা রহিয়াছে তাহাও অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ। তিনি সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান। তিনি যেমন এক তেমনি নানা, কাজেই জগৎ-প্রপঞ্চ ভ্রম নয়। ইহা ব্রহ্মেরই স্বরূপ। ব্রহ্ম নির্গুণ নন, তিনি সর্ব্বগুণের আধার; তিনি একদিকে অপরিবর্ত্তনীয় অপর দিকে পরিবর্ত্তনমান। তিনি কর্ম্মফলের বিধাতা, সেইজন্য কর্ম্মের নিয়মের দ্বারা তিনি আবদ্ধ নন, সেইজন্য তিনি কৃপা করিলে কর্ম্মবন্ধন হইতে আমাদের মুক্ত করিতে পারেন। বল্লভের গ্রন্থে এইজন্য ভক্তিবাদের উপর খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। বল্লভ ও তাঁহার শিষ্যেরা ভক্তিতত্ত্বের যেরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন সেরূপ অন্যত্র দেখা যায় না। বল্লভ এবং তাঁহার শিষ্যদের গ্রন্থে

শঙ্কর-মতের বিরুদ্ধে অনেক তর্কযুক্তি থাকিলেও সে সমস্ত তর্কযুক্তি মধ্বানুবর্ত্তীদের তর্কযুক্তির ন্যায় নিপুণতা, সূক্ষ্মতা ও গভীরতা লাভ করে নাই। আমার History of Indian Philosophyর মুদ্রমাণ চতুর্থ খণ্ডে, মধ্ব ও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যদের সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য—শ্রীচৈতন্য বল্লভের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি কোনো গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই, তবে কবিরাজ-গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সঙ্গে তাঁহার যে আলোচনার কথা বিবৃত আছে তাহা যদি সত্য হয় তবে একথা বলিতেই হয় যে তিনি মায়াবাদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, অথচ তিনি ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ছিলেন। ঈশ্বরপুরী শঙ্করের দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। যদিও তিনি কোন গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই তথাপি তাঁহার জীবনে ঈশ্বরপ্রেমের একান্ত বিহ্বলতা দেখাইয়া গিয়াছেন। এইরূপ বিহ্বলতার চিত্র আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষে কিম্বা অন্য কোথাও পাই না। পরবর্ত্তী-কালে জীবগোস্বামী গোপালভট্টের ষট্‌সন্দর্ভকে নূতন করিয়া সংস্কার করেন। এই গ্রন্থে তিনি প্রধানভাবে শ্রীমদ্‌ভাগবতের তাৎপর্য্য অনুসারে আত্মতত্ত্ব, ভগবত্তত্ত্ব

ও ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন, উড়িষ্যাবাসী বলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মসূত্রের একটী ভাষ্য রচনা করেন। এই ভাষ্যরচনায় তিনি মধ্বমতের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কি-ষট্‌সন্দর্ভে, কি বলদেবের গোবিন্দভাষ্যে কোনরূপ বিশেষ তর্কযুক্তির অবতারণা নাই। ব্রহ্ম তাঁহার স্বরূপ-শক্তি ও তটস্থ-শক্তির দ্বারা সমন্বিত হইয়া জগৎ রচনা করিয়াছেন এবং জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি তিনি নিজে তাঁর অন্তরঙ্গ স্বরূপ-শক্তিতে সকলের বাহিরে স্বতন্ত্র রহিয়াছেন। সূর্য্য যেমন তাহার রশ্মি দ্বারা সমস্ত ভুবনকে আলিঙ্গন করিলেও নিজে অবিকৃত থাকে, ঈশ্বরও তেমনি তাঁহার শক্তিতে জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগতের দোষগুণের দ্বারা আক্রান্ত হন নাই। যাহাকে ব্রহ্ম বলা যায় তাহাই পরমাত্মা, তাহাই ভগবান, এই জগৎ ব্রহ্মের শক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে সেইজন্য ইহা একদিকে যেমন ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অপরদিকে তেমনি ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন ও তাঁহার অধীন। ইহাও ভেদাভেদবাদেরই একটী প্রকার মাত্র অথচ ঠিক কি অংশে ভিন্ন এবং কি অংশে অভিন্ন তাহা যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝা যায় না, সেইজন্য এই মতটাকে অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত বলা হয়। জীব গোস্বামী বহু পুরাণকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং

বিশেষ ভাবে সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের অবতারণা না করিয়া প্রধানতঃ শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণের বাক্যকেই প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইয়া তাহাই ব্যাখ্যাচ্ছলে আপন মত প্রকাশ করিয়াছেন। এইজন্য দার্শনিকতা হিসাবে কি ষট্‌সন্দর্ভ, কি গোবিন্দভাষ্য ইহাদের কোনটাকেই খুব উচ্চ স্থান দেওয়া যায় না। এই সম্প্রদায়ের বিশেষ কোনো তর্ক-গ্রন্থ নাই। অপরের মত খণ্ডন করিতেও ইহারা বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। এই দুইটী দার্শনিক গ্রন্থের বিশেষ কোনো প্রভাব না থাকিলেও চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ভক্তিধর্ম্ম বাংলা ও উড়িষ্যা দেশকে একসময় প্লাবিত করিয়াছিল এবং এখনও বাংলা দেশে এবং উড়িষ্যায় ইহার প্রভাব বড় কম নয়। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মত ও বিশ্বাস আমার History of Indian Philsophyর মুদ্রমান চতুর্থ খণ্ডে বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

গীতা:—যাহা বলা হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে উপনিষদের তাৎপর্য্য প্রথমতঃ গীতা ও ব্রহ্মসূত্রে নির্ণীত হয়। গীতা কাব্যাকারে লিখিত, সেই-জন্য গীতার অর্থ লইয়া পরবর্ত্তীকালে অনেক মতভেদ হইয়াছে এবং প্রাচীন কাল হইতে নানালোকে গীতার নানারূপ ভাষ্য ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছেন এবং এখনও

মনীষীরা গীতার নব নব ব্যাখ্যা করিতেছেন এমন কি রাজনীতিবিদেরাও গীতার দখল ছাড়েন নাই। লোকমান্য তিলক ও মহাত্মা গান্ধী ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। এ অবস্থায় গীতা কি মত পোষণ করিয়াছে তাহা জোর করিয়া বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। আমার History of Indian Philosophyর দ্বিতীয় খণ্ডে গীতার ভগবদ্‌তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এইরূপ :—ঋক বেদীয় পুরুষসূক্তে লিখিত আছে যে মহান্ পুরুষ বা ঈশ্বরের তিন ভাগ অমৃতলোকে এবং একভাগ পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে ইনি ঊর্দ্ধমূল ও নিম্নশাখা অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায়। তাৎপর্য্য এই যে ইহার যথার্থ স্বরূপ জগতকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে। গীতা, উপনিষদের এই উপমাটী গ্রহণ করিয়াছে। ঈশ্বরের যে অংশ পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহা মায়া নহে তাহা সত্য। যাহা কিছু আমরা দেখি সমস্তই ঈশ্বরের হইতে আসিয়াছে তথাপি ঈশ্বর আপনাকে জগতের মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন করিয়া দেন নাই। তাঁর একটি অংশ এজগতকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মরূপে রহিয়াছে কিন্তু পুরুষরূপী ঈশ্বর এই ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া আছেন। সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত জীব, সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি, অহঙ্কার এমন কি ব্রহ্ম পর্য্যন্ত ঈশ্বরের

অংশ বিশেষ। ঈশ্বর ইহাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া আছেন অথচ এই ঈশ্বর জগতে মানবরূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন, এই চিন্তাটী উপনিষদের কোথাও নাই। ইহা গীতার নূতন চিহ্ন, নূতন কল্পনা। এইখানেই অবতারতত্ত্বের আরম্ভ। গীতার ঈশ্বর নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে মানুষের সহিত দৈনন্দিন সম্বন্ধে যুক্ত। একদিকে তিনি সর্ব্বভুবনের আশ্রয়, সর্ব্বসত্বার আশ্রয়, অপরদিকে তিনি মানুষের সহিত প্রেমে আবদ্ধ। তাঁহার যে অংশ জগতকে ব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহা অব্যক্ত; অথচ এই অব্যক্তের মধ্যে তিনি আপনাকে শেষ করিয়া দেন নাই। একদিকে মানুষের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াও অপরদিকে তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন। জগতের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া থাকিয়াও তিনি জগতের বাহিরে সকলের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইয়াও তিনি সকল সম্পর্কের বাহিরে, ইহাই গীতার ঈশ্বরতত্ত্বের মুখ্য তাৎপর্য্য, পরমার্থ ভাবে বিচার করিলে আমরা সকলেই ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় কর্ম্ম করিয়া থাকি এবং সেইজন্য পরমার্থ বিচারে আমরা কেহই আমাদের পাপপুণ্যের জন্য দায়ী নই। অজ্ঞানতা নিবন্ধনে আমরা আমাদিগকে আমাদের কর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়া মনে করি এবং কর্ম্মের দায়িত্ব ঘাড়ে লইয়া কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকি।

ঈশ্বরকে ব্রহ্মরূপে বুঝিলেই ঈশ্বরকে বোঝা শেষ হয় না। তিনি যে ব্রহ্মকেও অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন ইহা না বুঝিলে ঈশ্বরকে বোঝা হয় না। গীতার এই মত একরূপ ভেদাভেদ বাদই বলা চলে। যাহার যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হয় ঈশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্মফলত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে কার্য্য করিয়া যাওয়াই গীতার মুখ্য উপদেশ। গীতা হইতেই ভক্তিধর্ম্মের প্রথম আবির্ভাব। পরবর্ত্তী কালে পঞ্চরাত্র, আগম ও আড়োয়াড়দের গ্রন্থে এই ভক্তি বিশেষ ভাবে পুষ্টিলাভ করে। শঙ্করের পূর্ব্বতন ব্যাখ্যাতৃদের কথা আমরা যাহা পাই এবং ব্রহ্মসূত্রের পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা পাই তাহাতে মনে হয় যে উপনিষদের প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃগণ উপনিষদ্‌কে এই ভেদাভেদের দৃষ্টিতেই দেখিতেন। শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরা এই ভেদাভেদ মতকে পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতমতকে স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু শঙ্করের পরবর্ত্তীকালে ভাস্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, বল্লভ প্রভৃতিরা এই ভেদাভেদবাদকেই নব নব রূপে স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। মধ্ব একান্ত ভাবে দ্বৈতমতকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ভক্তিবাদই নানারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে থাকে কিন্তু শঙ্করের তেজস্কর অদ্বৈতমতটা কখনই

তাহার দাবী ছাড়ে নাই। এইরূপে বেদান্তদর্শনের ধারা একদিকে জ্ঞান ও অপরদিকে ভক্তিরূপে প্রবাহিত হইয়া কেবল দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে আপনাকে শেষ করিয়া দেয় নাই কিন্তু ধর্ম্মরূপে সকলের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলের জীবনকে শ্রেয়ের পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। ভারতের দর্শনশাস্ত্র কেবল শুষ্ক বিচার নয় ইহা জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনের সামগ্রী; তাই কোনো ব্যক্তি-বিশেষের জীবনান্তের সহিত ইহার মৃত্যু ঘটে নাই কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ইহা মানব জীবনকে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে।

পূর্ব্ব মীমাংসা :—মীমাংসা শব্দের অর্থ বিচার। বেদের উত্তর ভাগ, উপনিষদ্ বা বেদান্ত সম্বন্ধে যে বিচার ব্রহ্ম সূত্র প্রভৃতিতে দেখা যায় তাহাকে উত্তর-মীমাংসা বলা যায়, তেমনি বেদের পূর্ব্বভাগ অর্থাৎ যাগযজ্ঞ সম্পাদন বিষয়ে যে সমস্ত বিচার ও আলোচনা আছে তাহাকে পূর্ব্ব-মীমাংসা বলে। অতি আদিম কালে হয়ত ঋষিরা সহজ-ভাবে বৈদিক স্তোত্রের দ্বারা বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির আরাধনা করিতেন কিন্তু পরবর্ত্তীকালে এই আরাধনা বিশেষ বিশেষ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। এই অনুষ্ঠানের মূলে কতকগুলি ধারণা দেখা যায় যথা :—

বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ ঈশ্বর বা অন্য কোনো ব্যক্তি বেদ রচনা করেন নাই। বেদ অনাদি কাল হইতে আকাশে নিত্য হইয়া রহিয়াছে। বিভিন্ন ঋষিদের মনে তাহা আবির্ভূত হইয়াছে মাত্র। অতএব বেদে কোনো ভ্রম বা কোনো পুনরুক্তি নাই। যাহা মানুষ বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে পারে না সেইরূপ কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য নির্ণয় করাই বেদের উদ্দেশ্য, সেইজন্য বেদের বাক্য, হয় কাহাকেও কোনো কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে আদেশ দিতেছে নয় কোনো কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে আদেশ দিতেছে। ইহাকে বলে বিধি এবং নিষেধ, যদি কোনোখানে বেদের কোনো বস্তু বা ঘটনার বর্ণনা থাকে তবে তাহা যথার্থ বা সত্য বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। সেই জাতীয় বাক্যগুলিকে কোনো কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার বা নিবৃত্ত করাইবার ছল মাত্র। যেমন লোকে শিশুদের বলে "ঝাল খাও, ঝাল খাইলে বিবাহ হইবে।" ঝাল খাওয়ার সহিত বিবাহের সম্পর্ক নাই তথাপি বিবাহ হওয়ার আশায় শিশু হয়ত উৎফুল্ল হইয়া ঝাল খাইবে। এইরূপ প্ররোচক বাক্যকে অর্থবাদ বলে। জৈমিনি তাঁহার মীমাংসা-সূত্রে নানা জাতীয় যাগ-যজ্ঞাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার উপর শবরস্বামী ভাষ্য করেন; এই ভাষ্যের উপর কুমারিল

পদ্যে ও গদ্যে টীকা করেন। এবং প্রভাকর ইহার উপর বৃহতী নামে স্বতন্ত্র টীকা লিখিয়া নানা বিষয়ে কুমারিলের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধক্রমে সূত্রভাষ্যের ব্যাখ্যা করেন। ইহারা দুইজন সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতকের লোক। ইহাদের টীকার উপর অবলম্বন করিয়া পরবর্তীকালে মীমাংসা-শাস্ত্রের উপর অনেক গ্রন্থ লিখিত হয়। আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে বেদের বিধান ও নিষেধ বিবৃত হইয়াছে। এই জন্য বেদের সঙ্গে বিরোধ না থাকিলে স্মৃতিকে প্রমাণ বলিয়া ধরা হয়। স্মৃতি অনুযায়ী বেদবাক্য না পাওয়া গেলে মনে করিতে হয় যে সেইরূপ বেদবাক্য ছিল এখন লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু কোনো স্মৃতিবাক্য যদি কোনো বেদবাক্যের বিরোধী হয় তবে সেই স্মৃতি প্রামাণ্য (valid) নয়। স্মৃতি-বাক্যের অর্থ মীমাংসা শাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিতে হয়। এইজন্য মীমাংসার সহিত স্মৃতি-শাস্ত্রের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ এবং এই স্মৃতি-শাস্ত্রই হিন্দুর জীবনে সমস্ত কর্ত্তব্য বিধি নিষেধের দ্বারা অনুসন্ধান করে।

এখন কথা হইতেছে এই যে এই জাতীয় বিচারের সহিত দার্শনিকতার যোগ কোথায়, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বেদ কেবল বিধি দেয় বা হুকুম করে কিন্তু হুকুম

করিতে হইলেই কোনো ব্যক্তিকে হুকুম করে। কাজেই ব্যক্তিতত্ত্ব বা জীবতত্ত্ব মীমাংসার বিচারের বিষয়। জাগতিক বস্তু ছাড়া যজ্ঞ হয় না কাজেই জাগতিক বস্তুর স্বরূপটা এবং প্রমাণ বলিতে আমরা কি বুঝি তাহাও মীমাংসার বিচারের বিষয়। মীমাংসকেরা জগতকে সত্য বলিয়া মানেন এবং তাঁহারা কোনো ঈশ্বর মানেন না এবং জগৎ যে কোনো সময় সৃষ্ট হইয়াছিল এবং কোনো সময় যে ইহা ধ্বংস হইবে তাহাও তাঁহারা জানেন না কাজেই ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনো আলোচনা মীমাংসার বিষয় নহে; যাগযজ্ঞে নানা দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু মীমাংসকেরা সেই সমস্ত দেবতার স্বতন্ত্র সত্ত্বা মানেন না। উচ্চারিত মন্ত্রের মধ্যে তাঁহাদের সত্ত্বা, যথাযথভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হইলে এবং যথাযথভাবে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইলে সেই অনুষ্ঠানের ফলে যজ্ঞফল—যথা স্বর্গলাভ, পুত্রলাভ ইত্যাদি—লাভ করা যায়। কোনো দেবতার অনুগ্রহে ও বিদ্বেষে কোনো সুফল বা কুফল হয় না কাজেই স্বতন্ত্র দেবতা মানিবার কোনো প্রয়োজন নাই। কুমারিল মতাবলম্বীরা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এই ছয় প্রকার প্রমাণ বা জ্ঞানোপায় মানেন। প্রভাকর

মতাবলম্বীরা অনুপলব্ধিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া মানেন না, প্রত্যক্ষ অর্থে প্রধানতঃ যাহা চোখে দেখা যায় বা অন্য ইন্দ্রিয়ে উপলব্ধি করা যায়; উপমান অর্থে একটার সাদৃশ্য দেখিয়া আর একটাকে চেনা। জানা আছে যে Bison মহিষের মত: বনে মহিষের ন্যায় একটা প্রাণী দেখিয়া যখন ঠিক করি যে ইহা Bison তখন এই প্রমাণকে উপমান বলে; শব্দ অর্থে বেদবাক্যের প্রামাণ্য বোধ; [অর্থাপত্তির অর্থ implication. দেবদত্ত মোটা হইতেছে অথচ দিনে খায় না অতএব তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে যে সে রাত্রে খায়; যাহা দেখি না তাহা দেখি না বলিয়াই নাই ইহাকে অনুপলব্ধি বলে, যাহা দেখা যায় তাহা প্রত্যক্ষ কিন্তু যাহা নাই তাহার না-থাকাটা চোখে দেখা যায় না তাই না-থাকা বুঝিবার জন্য একটা স্বতন্ত্র অনুপলব্ধি প্রমাণ মানা হইয়াছে। বেদান্তীরা এই ছয় রকম প্রমাণ মানিয়া থাকেন।] মীমাংসকেরা জ্ঞানের স্বতঃ-প্রামাণ্য মানেন। স্বতঃ-প্রামাণ্যের তাৎপর্য্য এই যে প্রথম কোনো বিষয়ে জ্ঞান হইলেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্য প্রমাণের দ্বারা তাহা অসত্য বা মিথ্যা না বুঝি ততক্ষণ তাহা প্রামাণ্য বা সত্য বলিয়া মনে করি, বেদান্তীরাও জ্ঞানের স্বতঃ-প্রামাণ্য মানেন, মীমাংসকেরা

নিত্য ও বহু আত্মা মানেন। প্রভাকর বলেন যে আমাদের প্রত্যেক জ্ঞানের মধ্যেই একসঙ্গে আত্মা বা জ্ঞাতা, জ্ঞেয় বস্তু এবং জ্ঞান উপলব্ধি করি, ইহাকে বলে ত্রিপুটী প্রত্যক্ষ অর্থাৎ তিনটারই একসঙ্গে উপলব্ধি হয়। কুমারিলও বলেন যে, আত্মার সত্বা আমরা প্রত্যক্ষতঃ পাই না কিন্তু অনুমানে বুঝিতে হয়, তিনি আরও বলেন যে জ্ঞানকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না কিন্তু যখনই কোনো বস্তু জ্ঞাত বলিয়া মনে হয় তখন সেই জ্ঞাততা ধর্ম্মের দ্বারা আমাদের জ্ঞান হইয়াছে ইহা মনে করি। মীমাংসকেরা আত্মাকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া মনে করেন। কুমারিল বলেন যে, মানস প্রত্যক্ষের দ্বারা আমরা আত্মাকে জ্ঞাতা আমি বলিয়া বুঝিতে পারি। আত্মাই এই আমি বলিয়া বুঝিবার বস্তু। কুমারিল ও প্রভাকর উভয়েই আত্মাকে স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া মানেন না এবং সুসুপ্তিতে যে আনন্দের অনুভব হয় এ কথাও মানেন না, তাঁহারা বলেন যে সুসুপ্তিতে আমাদের কোনো জ্ঞান থাকে না। এইখানে শঙ্কর বেদান্তীদের সহিত মীমাংসকদের প্রভেদ। কুমারিল বলেন যে, আত্মা জ্ঞানশক্তিস্বরূপ কিন্তু জ্ঞান হইতে হইলে মন ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহিত সংযোগ হওয়া চাই। কিন্তু মোক্ষদশায় এইরূপ সংযোগ থাকে না কাজেই তখন কোনো জ্ঞান হয়

না। কাজেই মোক্ষের সময় আত্মার কোনো সুখ ও দুঃখ বোধ থাকে না। সমস্ত কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল নিত্যকর্ম্ম করিয়া গেলে কর্ম্মফল আর ঘটে না কারণ নিত্য-কর্ম্মের (যথা সন্ধ্যা, বন্দনা ইত্যাদি) কোনো ফল নাই। এইরূপে সকল সঞ্চিত কর্ম্ম যখন ভোগের দ্বারা ক্ষয় হয় এবং নূতন কর্ম্ম আর সঞ্চিত হয় না তখনই মোক্ষ হয়। ভারতীয় সকল দর্শনেই ভ্রম সম্বন্ধে একটা আলোচনা আছে। ভ্রম কাহাকে বলে। মীমাংসকেরা বলেন যে, যখন দড়িটা দেখি এবং তাহার সাদৃশ্যে পূর্ব্বে দেখা সাপের কথা স্মরণ হয় এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যখন বুঝিতে না পারি তখন দড়িকে সাপ বলিয়া মনে করি। এই ভ্রমের নাম অখ্যাতি। অদ্বৈত বেদান্তীরা বলেন যে, অল্প আলো থাকায় বা চোখের দোষে বা দূরত্বপ্রযুক্ত বা মানসিক বিকারের ফলে দড়িকে যখন আমরা সাপ বলিয়া মনে করি তখন সেই দড়ির উপর একটা অনির্ব্বচনীয় সাপের সৃষ্টি হয়। এইজন্য ভ্রমের বিষয়বস্তু অনির্ব্বচনীয়। জগতও এমনি একটা অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি, এই ভ্রমকে অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি কহে।

কাপিল ও পাতঞ্জল সাংখ্য (যোগ) :—সাংখ্য মত অতি প্রাচীন। উপনিষদে ও গীতায় সাংখ্য মতের উল্লেখ পাওয়া

যায় কিন্তু প্রাচীন সাংখ্য মত কি ছিল এবং ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহা কিরূপে ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত সাংখ্য-কারিকার সাংখ্যে পরিণত হইল, তাহা বহু আলোচনার বিষয়। তবে এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে ঈশ্বরকৃষ্ণের বর্ণিত সাংখ্যমত সেই অবস্থায় আসিবার পূর্ব্বে সাংখ্য সম্বন্ধে নানামত প্রচলিত ছিল। হয়ত ব্রহ্মসূত্রেরও সাংখ্য মতের কোনো ভাষ্য ছিল। পরবর্ত্তীকালে (আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে) বিজ্ঞানভিক্ষু ব্রহ্মসূত্রের উপর সাংখ্যমতের একটী ভাষ্য লেখেন। ইহার নাম বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য। চরকে শারীর স্থানে যে সাংখ্যমতের আলোচনা পাওয়া যায় তাঁহাই সর্ব্বপ্রাচীন সাংখ্য শাস্ত্রের বিস্তৃত বর্ণনা। চরকের সমসাময়িক অর্থাৎ খৃষ্টীয় প্রথম শতকে লিখিত অশ্বঘোষের বুদ্ধ চরিত অড়াঢ় নামক এক ঋষি সাংখ্যমতের একটী বিবৃতি দিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে লিখিত ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকাই সাংখ্যের প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া মনে করা হয়। গৌড়পাদ ও বাচস্পতি মিশ্র এই সাংখ্যকারিকার সত্তরটী শ্লোকের টীকা করেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতকে হরিভদ্র শূরি তাঁহার ষড়্দর্শন সমুচ্চয়ে সাংখ্যদর্শনের একটী বিবৃতি দিয়াছেন। গুণরত্ন উহার উপর একটী টীকা লিখিয়াছেন। ইহা বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া পরবর্ত্তীকালে লিখিত সাংখ্যসূত্র বলিয়া একখানি গ্রন্থ আছে। অনিরুদ্ধ এবং বিজ্ঞানভিক্ষু উভয়েই ইহার উপর টীকা লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যসার বলিয়া একখানি গ্রন্থ লেখেন, তত্ত্ব-সমাস বলিয়া পরবর্ত্তীকালে লিখিত সাংখ্যের আর একখানি গ্রন্থ আছে। উহা ছাড়া সীমানন্দ বিরচিত সাংখ্য-তত্ত্ব বিবেচন ও ভাবাগণেশ বিরচিত সাংখ্যতত্ত্ব যাথার্থ্যদীপন—গ্রন্থ দুইখানিও পরবর্ত্তীকালে লিখিত হইলেও উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া অনেক পুরাণের মধ্যে সাংখ্যমত সম্বন্ধে অনেক বিবৃতি আছে। রামানুজ ও তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যেরাও স্বসিদ্ধান্ত অনুসারে সাংখ্যের বিবৃতি দিয়াছেন। যোগশাস্ত্র প্রধানতঃ সাংখ্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলি তাঁহার যোগ-সূত্র লেখেন। খৃষ্টীয় চতুর্থশতকে কোনো এক ব্যাস ইহার উপর ভাষ্য লেখেন। ইহার নাম ব্যাস-ভাষ্য। খৃষ্টীয় নবমশতকে বাচস্পতি মিশ্র ইহার উপর যে টীকা লেখেন তাহার নাম তত্ত্ববৈশারদী। খৃষ্টীয় দশমশতকে ভোজ যোগসূত্রের উপর এক বৃত্তি লেখেন তাহার নাম ভোজ-বৃত্তি। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে বিজ্ঞানভিক্ষু ব্যাস-ভাষ্যের উপর এক টীকা লেখেন; ইহার নাম যোগবার্ত্তিক।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে নাগেশ একটী টীকা লেখেন তাহার নাম ছায়া-ব্যাখ্যা। এই গ্রন্থখানি প্রধানতঃ যোগ-বার্ত্তিককেই আশ্রয় করিয়া লেখা হইয়াছে। উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রেই যোগের কথা উল্লিখিত আছে। বৌদ্ধ এবং জৈনেরাও আপন আপন শাস্ত্রে আপন আপন মতানুসারে যোগের ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু এই বৌদ্ধ ও জৈন যোগ সাংখ্য মতাবলম্বী নহে। গীতায় যে যোগের কথা উল্লিখিত আছে তাহা পতঞ্জলির যোগ হইতে বিভিন্ন। আমরা যোগকে পাতঞ্জল সাংখ্য বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছি।

সাংখ্য ও যোগের মূল বক্তব্য কথাটী এই:—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকার বস্তুর দ্বারা জাগতিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ বস্তু নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাদিগকে গুণ কহে, গুণ শব্দের অর্থ দড়ি, দড়ির ন্যায় ইহারা পুরুষ বা চৈতন্যকে বিষয় বস্তুর সহিত বাঁধিয়া রাখে এইজন্য ইহাদের গুণ বলে, বাহ্য ও আন্তর সমস্তই ইহাদের দ্বারা নির্ণীত বলিয়া সাংখ্য কারিকায় ইহাদের দুই রকম স্বভাবের কথাই উল্লেখ করিয়াছে। সত্ত্ব একদিকে যেমন লঘু অপরদিকে তেমনি প্রকাশক ও প্রীতি মূলক। রজঃ চলস্বভাব ও দুঃখমূলক; তমঃ গুরু, আবরক এবং মূঢ়তামূলক।

ইহারাই জগতের আদিম উপাদান বলিয়া ইহাদিগের কোনো স্পষ্ট ধর্ম্ম বা স্পষ্ট স্বভাবের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। যথার্থতঃ বলিতে গেলে যে ধর্ম্মগুলির উল্লেখ করা গেল তাহাও বলা চলে না কারণ এই বর্ণনাগুলি আমাদের অনুভবের সহিত মেলে কিন্তু যাহা আমাদের অনুভবেরও কারণ ও উপাদান এবং যাহা সমস্ত বাহ্যবস্তুর উপাদান তাহাকে অনুভব গ্রাহ্য ধর্ম্মের দ্বারা বর্ণনা করা চলে না। কেবল মোটামুটি বুঝিবার জন্যই এই তিনটী গুণের বিভিন্ন ধর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে তাই একস্থানে লিখিত আছে যে, গুণগুলির যথার্থরূপ জানিবার কোনো উপায় নাই, তাহার যে রূপগুলি চোখে পড়ে বা অনুভব গম্য হয় তাহার কোনো মূল্য নাই। তাহা মায়ার মত তুচ্ছ। যে কারণ হইতে প্রীতি উৎপন্ন হয়, লঘুতা উৎপন্ন হয়, জ্ঞানের প্রকাশতা হয় বা বস্তু প্রকাশযোগ্য হয় তাহাকে বলা যায় সত্ত্ব। যে কারণ হইতে চলন বা গতি উৎপন্ন হয় বা অপ্রীতির উৎপাদন হয় তাহাকে বলা যায় রজঃ। আর যে কারণ হইতে গুরুতা, মূঢ়তা এবং অজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে বলা যায় তমঃ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সাংখ্যমতে এই তিনপ্রকার দ্রব্যই জগতের আদি কারণ, অবশ্য এগুলিকে দ্রব্যও বলা

যায়, গুণও বলা যায়, সম্বন্ধও বলা যায় ; এই তিন প্রকার দ্রব্য ছাড়া আর কোনো মূল পদার্থ নাই। এই তিন প্রকারের দ্রব্যই যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ভাবিতে পারি। আমাদের মন, চিন্তা, বুদ্ধি, জল, বাতাস, আলো, আকাশ ইহাদের সকলের সূক্ষ্ম কারণ। ইহাদেরই বিভিন্ন প্রকারের মিলনে এবং সংগঠনের বৈচিত্র্যে, ন্যূনাধিক্যে যে পরিণতি বা পরিণাম ঘটে তাহারই ফলে আর সমস্ত বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ রূপে সকল কার্য্যই ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে, এই জন্য সাংখ্য বলে যে কার্য্য ঘটাইবার ক্রিয়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেও কার্য্য কারণের মধ্যে নিহিত হইয়া রহিয়াছে। কার্য্য ঘটাইবার ক্রিয়া দ্বারা যাহা রহিয়াছে তাহাকেই অভিব্যক্ত করা হয় মাত্র। একটী পাথরকে খুঁদিয়া মূর্ত্তি করিবার পূর্ব্বেই মূর্ত্তিটী পাথরের মধ্যেই ছিল। খুঁদিবার চেষ্টাতে যে মূর্ত্তি সূক্ষ্মভাবে ছিল তাহা অভিব্যক্ত হইল মাত্র। কারণ-কার্য্যের এই মতকে সৎকার্য্যবাদ এবং পরিণামবাদ বলে। অদ্বৈত-বেদান্তীরা বলেন যে কারণই একমাত্র সৎ বস্তু, কার্য্য মিথ্যা ; কারণ, কার্য্য কারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। পাথরে খোঁদা মূর্ত্তি পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়। মূল কারণই একমাত্র সত্য এবং সমস্ত কার্য্য মিথ্যা। ব্রহ্মই

একমাত্র সত্য এবং জগৎ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহাকেও সংকার্য্যবাদ বলে, কিন্তু ইহা পরিণামবাদ নহে, ইহাকে বলে বিবর্ত্তবাদ। [সাংখ্য মতে জগৎ সত্য এবং তাহা ত্রিগুণাত্মক। একেবারে মূলে গেলে দেখা যায় যে এই তিনটী গুণ পরস্পরকে এমন করিয়া বাধা দিয়া রহিয়াছে যে কোনো গুণটীই প্রবল হইয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। এইটীই হইল গুণের সাম্যাবস্থা। গুণত্রয়ের এই সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতির মধ্যে সমস্ত জগৎ সূক্ষ্মাবস্থায় রহিয়াছে। হঠাৎ যখন কোনো সময় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়া সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া উঠে তখনই সৃষ্টি আরম্ভ হয়। সৃষ্টির এই প্রথম স্তরকে বুদ্ধি বা মহৎ বলা হয়।] মনে রাখিতে হইবে যে সাংখ্য-মতে গুণগুলি জড় অর্থাৎ অচেতন কাজেই আমাদের অন্তরে সুখ, দুঃখ, চিন্তা, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই ত্রিগুণাত্মক এবং সেইজন্য পৃথিবীর সমস্তই অচেতন। প্রথম যখন বুদ্ধির সৃষ্টি হয় সেই বুদ্ধি-তত্ত্বের মধ্যে সকল প্রাণীর বুদ্ধি নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। ইহাকে সেইজন্য কারণবুদ্ধি বলে। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যখন এই বুদ্ধির প্রকাশ হয় তখন সেই পৃথক পৃথক বুদ্ধিকে কার্য্যবুদ্ধি বলে। সত্ত্বগুণের বুদ্ধিতে

বুদ্ধিতত্ত্ব অভিব্যক্ত হয়, ইহার পর যখন একটু রজোগুণ বাড়িয়া উঠে তখন বুদ্ধিতত্ত্বকে অবলম্বন করিয়াই তাহার পূর্ণতর প্রকাশে অহংকারতত্ত্ব অভিব্যক্ত হয় ; এই অহংকার-তত্ত্বই সকলের মধ্যে যে আমি-ভাব আছে তাহার উপাদান কারণ। বুদ্ধিকে ছাড়িয়া অহংকারের পৃথক প্রকাশ নাই তাই সাংখ্য বলেন যে বুদ্ধির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াই যে একটী নূতন প্রকার বা phase পৃথক হইয়া দাঁড়ায় তাহাকেই অহংকার বলা হয়। এই অহংকার হইতে সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণের পৃথক পৃথক স্তরের বৃদ্ধিতে তিনটি শাখায় তিন রকমের সৃষ্টি হয়। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, ঘ্রাণ লওয়া ও আস্বাদ লওয়া—অভিব্যক্ত হয়। রজোগুণের বৃদ্ধিতে পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় অভিব্যক্ত হয়, যথা—বাক্, পাণি, পাদ, পায়, মল ত্যাগ করিবার ক্ষমতা—উপস্থ-জনন শক্তি। সত্ত্ব ও রজঃ এই উভয় গুণের তুল্য বৃদ্ধিতে অভিব্যক্ত হয় মন। তমোগুণের বৃদ্ধিতে অহংকার-তত্ত্বের যে অবস্থা হয় তাহাকে বলে ভূতাদি অর্থাৎ এই তমোগুণের বৃদ্ধিসম্পন্ন অহংকার হইতেই পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি, এই ভূতাদি অহংকার হইতে প্রথম অভিব্যক্ত হয় পঞ্চ মহাভূতের আদি কারণ পঞ্চ তন্মাত্র। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে আরও তমোগুণের

বুদ্ধিতে পঞ্চ মহাভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ উৎপন্ন হয়। পঞ্চ তন্মাত্রের মধ্যে পঞ্চ মহাভূতের সমস্ত শক্তি সূক্ষ্মভাবে থাকে (potentialy) ; কিন্তু সে অবস্থায় তাহাদের বিভিন্ন স্বভাবের কোনো অভিব্যক্তি হয় না। এগুলি যেন electron জাতীয়। Electron হইতে যেমন বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, অথচ সেই পদার্থের পরমাণুগুলি কোনো স্বভাব অভিব্যক্তভাবে electron-এর মধ্যে পাওয়া যায় না তেমনি পঞ্চ মহাভূতের পরমাণুগুলি, পঞ্চ তন্মাত্রের মধ্যে পাওয়া যায় না অথচ তাহারা তাহার মধ্যেই সূক্ষ্মভাবে রহিয়াছে। প্রকৃতি আপনাকে বুদ্ধি, অহংকার, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত এই ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে পরিণত করে। প্রকৃতিকে লইয়া মোট চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টির পর তাহাদের পরস্পরের মিলনে ও সংমিশ্রণে যে সমস্ত নূতন নূতন পদার্থ হয় তাহাকে আর পৃথক পদার্থ বলিয়া মানা হয় না। কারণ তাহাদের আর কোনো নূতন প্রকারের ধর্ম্ম হয় না। তেমনি বুদ্ধি, অহংকার এবং ইন্দ্রিয়গুলির ব্যাপারে অন্তরের মধ্যে যে সমস্ত নূতন নূতন আন্তরিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাকেও আর নূতন তত্ত্ব বলিয়া মানা যায় না। ইহাই প্রাকৃতিক সৃষ্টি।

প্রকৃতি ছাড়া সাংখ্য আর একটি নূতন তত্ত্ব মানেন, সেটী হইতেছে পুরুষ। এই পুরুষ বিশুদ্ধ চেতনস্বরূপ। ইহার কোনো প্রকারের পরিবর্ত্তন নাই। ইহার কোনো হেতু নাই। ইহা কোনো কার্য্যে পরিণত হয় না। সর্ব্বদা অবিকৃত ভাবে একরূপ থাকে। অথচ ইহারা বহু। প্রত্যেক জীবের মধ্যে তাহার বুদ্ধি, অহংকার এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত তার অধিষ্ঠাতারূপে ইহার স্থান। ইন্দ্রিয় দ্বারা যখন আমরা প্রথম কোনো বাহিরের বস্তুর সহিত বুদ্ধি ও অহংকারের সম্পর্ক ঘটাই তখন সেই পদার্থের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়া আমাদের বুদ্ধি তদাকারে পরিণত হয়। এই বুদ্ধির উপর চেতনার প্রতিবিম্ব পড়িলে এবং বুদ্ধি চৈতন্যের উপর প্রতিবিম্বিত হইলে সমস্ত বুদ্ধি চেতনাময় হইয়া উঠে; অহংকার চেতনাময় হইয়া উঠিয়া সেই জ্ঞানকে আমার জ্ঞান বলিয়া মনে করে এবং বুদ্ধিস্থ সুখ দুঃখাদির উপাদান, সুখ দুঃখরূপে চৈতন্যময় হইয়া ওঠে। এই সুখ দুঃখ ধর্ম্ম কেবল অন্তরের নয় বাহিরের বস্তুর মধ্যেও সুখ দুঃখ সেই সেই বস্তুর উপাদানরূপে রহিয়াছে কারণ সুখ দুঃখ সত্ত্ব ও রজোগুণের ধর্ম্ম। ভিতর বাহিরে কোনো পার্থক্য নাই। বাহিরে যাহা স্থূলরূপে আছে, অন্তরের বুদ্ধিতে তাহাই সূক্ষ্ম রূপে আছে। চৈতন্যময় পুরুষকে যে আমরা বুদ্ধির

অচেতন ধর্ম্মের সহিত এক করিয়া দেখি এবং বুদ্ধির অচেতন ধর্ম্মকে যে আমরা চেতনাময়রূপে দেখি এই পরস্পরের ভেদ না বুঝিয়া পরস্পরকে এক করিয়া যে ভ্রম করি এই "অখ্যাতি" ভ্রমের ফলেই পুরুষ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব হইলেও বদ্ধরূপে কর্ম্ম করে কর্ম্মফল ভোগ এবং জন্ম জন্মান্তরের চক্রে ভ্রমণ করিতে থাকে বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধি ও পুরুষের মধ্যে যে একটা অলঙ্ঘণীয় ভেদ রহিয়াছে তাহারা যে পরস্পর একান্ত বিভিন্ন ইহা বুঝিতে পারিলেই বুদ্ধি আপন ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হয় এবং পুরুষকে আর আপনার সহিত বাঁধিতে পারে না। তখনই ঘটে আমাদের মুক্তি। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম প্রকাশ, চৈতন্যও প্রকাশময়। এইজন্য সত্ত্বগুণের প্রাচুর্য্যে উৎপাদিত বুদ্ধিতত্ত্ব তাহার আপন স্বরূপকে পুরুষের উপর প্রতিবিম্বিত করিতে পারে এবং পুরুষের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে। সত্ত্বগুণের সহিত পুরুষের একটা সাম্য থাকাতেই এই ভ্রমটা সম্ভব হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে সত্ত্বগুণ রজোগুণের সহিত সংশ্লিষ্ট। সেইজন্য চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু পুরুষ সর্ব্বদা অচঞ্চল ও অপরিণামী। বুদ্ধি ও পুরুষে ভেদজ্ঞানই মুক্তির কারণ এই জ্ঞানকে বলা হয় বিবেকখ্যাতি বা সত্ত্বপুরুষান্যতখ্যাতি।

খ্যাতি অর্থ জ্ঞান, বিবেক অর্থ পার্থক্য। সত্ত্ব-পুরুষান্যতাখ্যাতি শব্দের অর্থ হইতেছে, সত্ত্ব ও পুরুষ যে পৃথক এই জ্ঞান। সত্ত্ব শব্দ এখানে বুদ্ধিকেই বোঝায়। অদ্বৈতমতের জ্ঞান প্রক্রিয়াও অনেকটা সাংখ্যমতের অনুরূপ। সেখানে অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বহির্বস্তুর সহিত সম্পর্কযুক্ত হইলে যে অবস্থা হয় তাহাকে বৃত্তি বলে। এই বৃত্তিকে অদ্বৈত-বেদান্তীরা অত্যন্ত স্বচ্ছ বলিয়া মনে করেন। এই বৃত্তির মূলে অধিষ্ঠানস্বরূপ যে ব্রহ্ম-চৈতন্য রহিয়াছে তাহা বৃত্তির মধ্য দিয়া উদ্ভাসিত হইলে, সেই ব্রহ্ম-চৈতন্য ও বহির্বস্তুর অভ্যন্তরে যে ব্রহ্ম-চৈতন্য রহিয়াছে তাহাও উদ্বুদ্ধ হয়, ফলে একদিকে যেমন বহির্বস্তুর প্রকাশ হয় তেমনি বহির্বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানেরও প্রকাশ হয়।

এখানে একটা কথা ওঠে এই যে প্রকৃতির সৃষ্টি যেভাবে হইয়াছে সেইভাবে কেন হইল। ইহার উত্তরে সাংখ্য বলেন যে প্রকৃতি জড় হইলেও তাহার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য রহিয়াছে। সে উদ্দেশ্য এই যে আমি পুরুষের কাজে লাগিব অর্থাৎ নানাবিধ ভোগের ছবির মধ্য দিয়া পুরুষকে টানিয়া লইয়া যাইব এবং সমস্ত ভোগের শেষে আমার বন্ধন হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া দিব। এই

পুরুষের প্রয়োজনানুবর্ত্তিতাকে পুরুষার্থতা বলে। বাস্তবিক পক্ষে পুরুষের কোনো প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন প্রকৃতির। সেই প্রয়োজন সে পুরুষের উপর আরোপ করিয়া যেন মনে করে যে আমি পুরুষের কাজে লাগিতেছি এবং এই পুরুষের কাজে লাগিবার পদ্ধতি অনুসারেই আমার সমস্ত পরিণতির ব্যাপার চলিবে। কর্ম্ম অনুসারে মানুষ সুখ দুঃখ ভোগ করে এবং নানাবিধ জন্মমরণের মধ্য দিয়া বিচরণ করে একথা প্রায় সমস্ত ভারতীয় দর্শনেই স্বীকৃত হইয়াছে। জগতের সর্ব্বপুরুষকে কর্ম্ম করিবার অবসর দেওয়া এবং সর্ব্বপুরুষকে যথোপযুক্ত কর্ম্মফল ভোগ করিতে দেওয়া, সুখ দুঃখ ভোগ করিতে দেওয়া যাহাতে ঘটিতে পারে, সেই অনুসারেই প্রকৃতির পরিণতি ব্যাপার চলিয়াছে এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এই জগতে যাহা কিছু নিয়ম আছে, যাহা সৃষ্ট হইয়াছে সকল-গুলিরই মূল তাৎপর্য্য এইখানে যে এইরূপ সৃষ্টি দ্বারা মানুষের moral purpose অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্ম করা এবং তাহার ফল ভোগ করা যাহাতে সুসম্পন্ন হয়। একথা মনে রাখিতে হইবে যে পুরুষ সর্ব্বদা মুক্তস্বভাব, তাহার কোনো বন্ধন নাই। প্রকৃতির আপন প্রতিবিম্বের দ্বারাই পুরুষ কর্ত্তা এবং ভোক্তা রূপে প্রতিভাত হয় এবং পুরুষের

কাল্পনিক বন্ধন ও কাল্পনিক মুক্তির কথা আমরা ভাবিতে পারি। প্রতি সৃষ্টির শেষে আসে প্রলয়। এই প্রলয়কালে সমস্ত সৃষ্টি লয়প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিরূপে পরিণত হয়। তাহার পরে যখন নূতন সৃষ্টিতে নূতন বুদ্ধিতত্ত্ব অভিব্যক্ত হয় তখন পূর্ব্ব সৃষ্টির পৃথক পৃথক বুদ্ধি আপন আপন পুরুষের সহিত অন্বীত হইয়া পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্মানুসারে পুরুষের সুখ দুঃখাদির কাল্পনিক ভোগ জন্মাইয়া থাকে। একই রকম বিষয়কে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন ফল দিয়া থাকে। একই স্ত্রী স্বামীকে যেমন সুখ দেয়, সপত্নীকে তেমনি ঈর্ষা বহ্নিতে দগ্ধ করে।

পাতঞ্জলসাংখ্য বা যোগে কাপিলসাংখ্যের পূর্ব্বোক্ত মত প্রায় সম্পূর্ণভাবেই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু যোগশাস্ত্রে ঈশ্বর মানা হইয়াছে। সাংখ্য নিরীশ্বর। যোগের ঈশ্বর অন্য পুরুষের ন্যায় একটী পুরুষ মাত্র। কিন্তু অন্য পুরুষের সহিত তাঁহার পার্থক্য এই যে তাঁহার কোনোদিন কোনো মলিনতার সংসর্গ ছিল না এবং তন্নিবন্ধন কোনো কর্ম্ম বা কর্ম্মফলের সহিতও তাঁহার কোনো সংসর্গ হয় নাই। প্রকৃতির মধ্যে মূঢ়ভাবে যে শক্তি রহিয়াছে তাহা যে মুখে প্রবাহিত হইয়া যেরূপ

সৃষ্টি হইলে পুরুষের প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে ঈশ্বর সেইদিকে প্রবাহের যে বাধা আছে তাহা অপসারণ করিয়া প্রকৃতির শক্তিকে পুরুষার্থের অনুকূলপথে প্রবাহিত হইবার অবসর দিয়া এই জাগতিক রচনার আনুকূল্য করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য সাংখ্য মতের খণ্ডন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে মূঢ় প্রকৃতি কি করিয়া জানিবে কোন পথে সৃষ্টি হইলে পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধি ঘটিবে। সেই আপত্তি যোগের ঈশ্বরবাদে খণ্ডিত হয়। তাহা ছাড়া সাম্যাবস্থায় অবস্থিত প্রকৃতি হঠাৎ বৈষম্য ঘটিয়া কেমন করিয়া সৃষ্টি আরম্ভ হয়, সাংখ্যে এ প্রশ্নের কোনো জবাব নাই। যোগে মতানুসারে ঈশ্বর মানিলে এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়।

সাংখ্য বলেন যে, বুদ্ধি ও পুরুষ যে বিভিন্ন এই জ্ঞান ঘটিলেই মুক্তি হয়। কিন্তু যোগ বলেন যে, আমাদের চিত্তের ধ্বংস না হইলে কেবল একটা দার্শনিক জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি হয় না। আমাদের চিত্তের মধ্যে বহু জন্মের সঞ্চিত নানা বাসনা রহিয়াছে। বিশেষ বিশেষ জন্মে সেই জন্মের উপযোগী বাসনা উদ্বুদ্ধ হইয়া নানা বিষয়ে আমাদের আকৃষ্ট করে এবং ভোগলোলুপ করে। তাহা ছাড়া বর্ত্তমান জন্মের সঞ্চিত নানাপ্রকার কর্ম্ম ও অনুভব সঞ্চিত হইয়া নানা

সংস্কারের সৃষ্টি করিয়া বিষয়ের দিকে আমাদের মনকে উন্মুখ করিয়া রাখে। যত আমরা নূতন নূতন বিষয়ের প্রতি আসক্ত হই ততই আমাদের চিত্ত বন্ধনময় হইয়া ওঠে। এইজন্য চিত্তকে যদি আমরা কোনো একটী বিষয়েতে আবদ্ধ করিয়া অচঞ্চল করিয়া রাখিতে পারি তবে বাহিরের বিষয়বস্তু হইতে পরিপুষ্টি না পাওয়াতে অন্তরের সংস্কারগুলি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিবে এবং চিত্তকে একস্থানে নিবদ্ধ করিয়া রাখিলে সেই সমাধিদশায় যে সমস্ত নূতন প্রজ্ঞা উদ্বুদ্ধ হইবে তাহাতে চিত্তের মলিনতা ধ্বংস পাইবে। চিত্তের মলিনতাকে যোগশাস্ত্রে বলা হয় ক্লেশ। ক্লেশ অর্থে বোঝা যায় অহংকার, রাগ, দ্বেষ, এবং আপনাকে সর্ব্বদা বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা। এই সমস্ত ক্লেশ কমাইবার জন্য প্রথমতঃ আমাদের চরিত্রকে বিশুদ্ধ করিতে হইবে, এবং সেইজন্য যম ও নিয়মের আশ্রয় লইতে হইবে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ (নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া অন্য কিছু না চাওয়া) এইগুলিকে যম বলে। তপস্যা, অধ্যয়ন, ঈশ্বরচিন্তা এইগুলিকে নিয়ম বলে। যম ও নিয়মের দ্বারা যেমন চরিত্র বিশুদ্ধ হইতে থাকে তেমনি প্রতিপক্ষ ভাবনার দ্বারা চিত্তকে আত্মস্থ করিতে হয়। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা এই চারিটাকে প্রতিপক্ষ

ভাবনা বলে। মনে কাহারও প্রতি ক্রোধ আসিলে ক্রোধের দোষ অনুধাবন করিয়া ক্রোধের বিষয়ের প্রতি নিজের চিত্তকে মৈত্রীভাবাপন্ন করিতে হয়। তেমনি অপরের দুঃখ দেখিলে তাহার প্রতি চিত্তকে করুণাসম্পন্ন করিতে হয় এবং অপরের সুখে সুখ অনুভব করিতে হইবে এবং অপরের অপরাধকে উপেক্ষার চোখে দেখিতে হইবে। এমনি করিয়া চিত্তের ক্লেশ যখন মোটামুটিভাবে কমিয়া যাইবে এবং সকলপ্রকার সাংসারিক ও বৈদিক কর্ম্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা যে পারলৌকিক ভোগ সুখ হয় তাহার প্রতি চিত্ত বিমুখ হইয়া হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইবে, হৃদয়ে যোগমার্গের প্রতি শ্রদ্ধা আসিবে।

পূর্ব্বোক্ত যম নিয়মাদির অনুষ্ঠানের ফলে চিত্তের ক্লেশ যখন ক্রমশঃ কমিয়া আসে বৈরাগ্যের দ্বারা মন যখন বিষয় হইতে পরাঙ্মুখ হয়, শ্রদ্ধা ও বীর্য্যের দ্বারা সকল যোগী যোগমার্গ অনুসরণ করেন, তখন আসন, প্রাণায়াম, শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ—ধ্যান, ধারণা এবং সমাধিদ্বারা তিনি যোগমার্গে অগ্রসর হইতে থাকেন। বসিবার যে ভঙ্গীতে বিনাকষ্টে মানুষ মনস্থির করিতে পারে তাহাকেই আসন বলে। পুনঃ পুনঃ একটী বস্তুকে মনের সম্মুখে রাখিবার চেষ্টার নাম ধ্যান। অন্য বস্তু হইতে মনকে নিবৃত্ত করিবার

চেষ্টাকে বলে প্রত্যাহার এবং একটি বস্তুতে স্থির করিয়া রাখার নাম ধারণা। এইরূপ ধারণা করিতে করিতে মনের চঞ্চলতা যখন নিবৃত্ত হয় তখন যে বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান করা হয় সেই বস্তুর ছবির সঙ্গে চিত্ত এমন করিয়া এক হইয়া যায় যে সেই বস্তুর ছবিটি ছাড়া চিত্তের মধ্যে আর কোনরূপ চাঞ্চল্য থাকে না। বস্তুটীর সঙ্গে চিত্ত যেন একরূপ হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থাকে সমাধি বলে। অনেক সময় সমাধি শব্দ ইংরাজীতে Concentration-রূপে অনুবাদ করা হয়, ইহা ঠিক নহে। কারণ Concentration-এর সময় চিত্ত পারিপার্শ্বিক বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া ধ্যেয় বিষয়ের মধ্যে চঞ্চলভাবে নানা সম্বন্ধের অনুসরণ করে। কিন্তু সমাধিতে চিত্ত ধ্যেয় বিষয়ের সহিত অচঞ্চল ভাবে একতাপন্ন হয়। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বস্তুকে লইয়া এই ধ্যান বা সমাধিমার্গ অনুসরণ করিতে হয়। প্রত্যেক সমাধির সঙ্গে সঙ্গে ধ্যেয় বস্তু সম্বন্ধে নূতন নূতন প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান এক কথা নয়। প্রত্যক্ষ দর্শনের ন্যায় প্রজ্ঞাদ্বারা বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে যে একটা নূতন উন্মেষ হয় তাহাকেই প্রজ্ঞা বলে। জ্ঞানের সংস্কারে যেমন বন্ধন ঘটে, প্রজ্ঞার সংস্কারে তেমন ঘটে না। ধ্যান, ধারণা, প্রাণায়াম, সমাধি প্রভৃতির

ফলে চিত্তের ক্লেশ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে এবং পূজা দ্বারা চিত্তের মলিনতা বিধৌত হইতে থাকে। একদিকে যম, নিয়মাদির দ্বারা চিত্তের স্থুল ক্লেশ কমিতে থাকে, বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্ত বহির্বিষয় হইতে পরাঙ্মুখ হয়, মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি প্রতিপক্ষ ভাবনার দ্বারা চিত্ত ক্রমশঃ বিষয়ের প্রতি রাগ, দ্বেষ বিবর্জ্জিত হয় ; তারপর প্রাণায়ামাদির দ্বারা চিত্ত যখন আরও বিশুদ্ধ হয় সমাধির দ্বারা যখন চিত্তের চঞ্চলতা নিরুদ্ধ হয় তখন একদিকে বাহিরের জগতের আক্রমণ হইতে চিত্ত যেমন মুক্তি পায় অপরদিকে চিত্ত বিশুদ্ধ হওয়াতে বাহিরের দিকে যোগীর আকর্ষণ কমিয়া যায় এবং সমাধি সমুৎপন্ন প্রজ্ঞার দ্বারা চিত্তের বাসনা ও সংস্কার ক্ষীণ হইতে থাকে। চিত্তের চঞ্চলতাকে বৃত্তি বলে। চিত্তের বৃত্তিকে স্তব্ধ করাকে যোগ বলে,

"যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ"

এইরূপ ক্রমশঃ স্থুল হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিষয় অবলম্বন করিয়া চিত্তের যখন একটা বিশেষ সমুন্নত অবস্থা ঘটে তখন কোনো বিষয়কেই অবলম্বন না করিয়া চিত্ত তাহার সমস্ত বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া দেয়। চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে এবং সমস্ত বাসনা ও সংস্কার ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে চিত্তের গাঁথুনী ভাঙ্গিয়া যায় কারণ

বাসনা, সংস্কার নব নব বিষয়ের আকর্ষণে চিত্তের চাঞ্চল্য ঘটায়, ইহারই ফলে বাহির হইতে সর্ব্বদা নূতন নূতন বিষয়ের খোরাক পাইয়া চিত্ত তাহার আপন স্বভাবকে দৃঢ় রাখিতে পারে, এইগুলি মিলিয়াই চিত্তকে নিমেষে নিমেষে গড়িয়া তুলিতে থাকে। এইগুলি না থাকিলে চিত্তের মধ্যে দানা বাঁধিবার কিছু থাকে না, এবং ইহার ফলে চিত্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং পুরুষ আপন স্ব-স্বভাবে, আপন কেবল-স্বভাবের মধ্যে মুক্তিলাভ করে। এই মুক্তিকেই যোগশাস্ত্রে কৈবল্যলাভ বলে। চিত্ত প্রকৃতি সমুৎপন্ন বস্তু, চিত্তাকারে তাহার ধ্বংস হইলে তাহা পুনরায় প্রকৃতির মধ্যে ফিরিয়া যায়। ইহাই পুরুষের চরম বন্ধন মুক্তি। প্রজ্ঞার একটী স্তরে বুদ্ধি ও পুরুষ যে বিভিন্ন এবোধ উৎপন্ন হয়, কিন্তু সাংখ্য যেমন বলেন যে এই বোধ উৎপন্ন হইলেই মুক্তি হয় যোগ তাহা বলেন না। যোগ বলেন যে চিত্ত ধ্বংস হওয়াতেই মুক্তি। শুধু জ্ঞানের দ্বারা এ চিত্ত ধ্বংস হয় না। যোগপ্রণালী অবলম্বনের ফলে চিত্ত যখন বিশীর্ণ হইয়া যায় তার বৃত্তি যখন একান্তভাবে নিরুদ্ধ হইয়া যায় তখনই চিত্ত বিনষ্ট হয়। সাংখ্যমতে বুদ্ধি এবং পুরুষের ভেদ বুঝিতে না পারাই ভ্রম। যোগমতে বুদ্ধিকে পুরুষ বলিয়া মনে করা এবং পুরুষকে

বুদ্ধি বলিয়া মনে করাই ভ্রম। এই ভ্রমকে অন্যথা-খ্যাতি বলে। একটা বস্তুকে আর একটী বস্তু মনে করিলে যে ভ্রম হয় তাহারই নাম অন্যথাখ্যাতি। মীমাংসা ও সাংখ্যের ভ্রমকে অখ্যাতি বলে। নৈয়ায়িক ও যোগের ভ্রমকে অন্যথাখ্যাতি বলে। যে সমস্ত চরম প্রজ্ঞার ফলে ক্রমশঃ চিত্ত বিনষ্ট হয় সেগুলি এইরূপ :—(১) দুঃখের কারণভূত সংসারকে জানিয়াছি, ইহা সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার নাই ; (২) সংসারের মূল কারণ উৎপাটিত হইয়াছে, আর উৎপাটন করিবার কিছু নাই ; (৩) নিরোধ-সমাধির দ্বারা এই উৎপাটন ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে ; (৪) পুরুষ প্রকৃতির ভেদ বোঝা গিয়াছে। এই প্রজ্ঞাগুলির পর কতকগুলির তাত্ত্বিক ঘটনা ঘটে, যথা :—(১) বুদ্ধির পুরুষার্থতা সম্পন্ন হইয়া যায় ; (২) চিত্ত বিশীর্ণ হইয়া প্রকৃতির অভিমুখে ধাবিত হয় ; (৩) বুদ্ধি আপন গুণস্বভাবে পরিণত হয়। সাংখ্য ও যোগে যে মুক্তি বা কৈবল্য হয় তাহাতে কোনো আনন্দ বা সুখ নাই কারণ আনন্দ বা সুখ প্রকৃতির ধর্ম্ম। পুরুষ স্ব-স্বরূপে কেবলমাত্র চৈতন্যময়।

ভারতবর্ষীয় সমস্তজাতীয় ধর্ম্মচিন্তার উপর অদ্বৈত-বেদান্ত এবং সাংখ্য-যোগের যে রকম প্রভাব তেমন আর

কিছুরই নাই। সমস্ত পুরাণগুলির মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্র এবং শৈব ও শাক্তদর্শন প্রভৃতিগুলির মধ্যে সাংখ্য যোগের মত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া রহিয়াছে। মহাভারতের মধ্যে, ভাগবতের মধ্যে এবং গীতার মধ্যে সাংখ্য যোগের মত একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। যোগচর্চ্চা মহেঞ্জোদাড়োর সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রায় সমানভাবেই ভারতীয় চিন্তাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে, এখনও কপিলাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং ভারতবর্ষের নানাস্থানে নানা পন্থার যোগে যোগাভ্যাস চলিতেছে। Europe এবং Americaতেও যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি নাই। হঠযোগের দ্বারা দেহের উপর যে নানা-জাতীয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আয়ত্ত করা যায় ইহা সর্ব্বজন-বিদিত এবং বর্ত্তমান চিকিৎসাশাস্ত্রও এসমস্ত ব্যাপারে কোনো সন্তোষজনক বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারে নাই। আমি নিজে একটী লোককে দেড়ঘণ্টাকাল মাটির মধ্যে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলাম, সেখানে দুই তিনজন ডাক্তারও উপস্থিত ছিল। দেড় ঘণ্টা পরে যখন তাহাকে তোলা হইল তখন তাহার স্বচ্ছন্দ অবস্থা দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। "নাস্তি সাংখ্য সমং জ্ঞানং, নাস্তি যোগসমং বলং", সাংখ্যের ন্যায় জ্ঞান নাই, যোগের ন্যায় বল নাই।

ন্যায় বৈশেষিক :—উলূকের পুত্র কণাদ বৈশেষিক-দর্শনের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইজন্য এই দর্শনকে কণাদ বা উলূক্যদর্শন বলা হয়। এই গ্রন্থ সূত্রাকারে লিখিত। সম্ভবতঃ ইহা বুদ্ধেরও পূর্ব্ববর্ত্তীকালে লিখিত। শুনা যায় যে প্রাচীন কালে ইহার উপর দুইটী টীকা লেখা হইয়াছিল, রাবণভাষ্য ও ভরদ্বাজভাষ্য। এই গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া ব্যোমবতী (ব্যোমশেখরাচার্য্য লিখিত), শ্রীধর লিখিত ন্যায়কন্দলী, উদয়ন লিখিত কিরণাবলী ও শ্রীবৎসাচার্য্য লিখিত লীলাবতী ইহার উপরই টীকা। প্রশস্তপাদ লিখিত প্রশস্তপাদ-ভাষ্য যথার্থত ইহার টীকা নহে, কিন্তু বৈশেষিক-দর্শনের সারমর্ম্ম অবলম্বনে লিখিত একখানি স্বতন্ত্রগ্রন্থ। ইহারই টীকার নাম ন্যায়কন্দলী। প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের উপর আরও দুইখানি টীকা লিখিত হইয়াছিল, তাহাদের নাম ভাষ্যসূক্তি ও কণাদরহস্য। শঙ্কর মিত্র পঞ্চদশ শতকে বৈশেষিক সূত্রগুলির একটী টীকা লেখেন তাহার নাম উপস্কার। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে ন্যায়কন্দলী অতি প্রসিদ্ধ। ইহা খৃষ্টীয় দশম শতকে বাঙ্গালী শ্রীধর কর্ত্তৃক লিখিত হয়। পরবর্ত্তীকালে বৈশেষিকদর্শন ন্যায়দর্শনের সহিত মিশিয়া যায় এবং

বৈশেষিকদর্শন তাহার স্বতন্ত্রতা হারাইয়া ন্যায়দর্শনের সহিত একীভূত হইয়া ন্যায়বৈশেষিক এই প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ন্যায়দর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য যুক্তিতর্কের নিরূপণ। প্রাচীনকাল হইতে ন্যায়শাস্ত্র আন্বীক্ষিকী নামে প্রসিদ্ধ। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে লিখিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আন্বীক্ষিকীকে সর্ব্ব শাস্ত্রের প্রদীপ বলিয়া বলা হইয়াছে। চরকসংহিতাতেও যুক্তি-তর্ক সম্বন্ধে যাহা দেখা যায় বোধ হয় যুক্তিশাস্ত্রে বা আন্বীক্ষিকী সম্বন্ধে উহাই প্রাচীনতম বিবরণ। ন্যায়সূত্র গোতম বা অক্ষপাদ প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ, উহা সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে লিখিত। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে বাৎসায়ণ ন্যায়সূত্রের এক ভাষ্য করেন। উদ্যোতকর খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে ন্যায়ের বিরুদ্ধে বৌদ্ধদের যুক্তি খণ্ডন করিয়া এক বার্ত্তিক লেখেন। খৃষ্টীয় নবম শতকে বাচস্পতি মিত্র ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য-টীকা নামে উহার উপর এক টীকা লেখেন। খৃষ্টীয় দশম শতকে উদয়ণতাৎপর্য্য-টীকা-পরিশুদ্ধি নামে উহার এক টীকা লেখেন। বর্দ্ধমান খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে উহার উপর আর একটী টীকা লেখেন, উহার নাম ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশ। এমনি করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের ধারা বরাবর চলিয়া আসিয়াছে।

মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায় কেবল ন্যায়ের প্রমাণগুলির উপর ত্রয়োদশ শতকে তাহার তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থ লেখেন। ইহার উপর অবলম্বন করিয়া নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচার পদ্ধতি বাঙ্গলা দেশে এত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দী হইতে রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ, গদাধর, জগদীশ প্রভৃতি নব্যন্যায়ে বাঙ্গলার মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। বৈশেষিকদর্শনে ছয়টী মূল পদার্থ মানা হইয়াছে—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়; ইহাদের মধ্যে সমবায় একটী সম্বন্ধ বিশেষ। যে সম্বন্ধে গুণ, কর্ম্ম, সামান্য বিশেষ দ্রব্যাশ্রিত হইয়া থাকে এবং যে সম্বন্ধে অংশ (part) অংশী (whole) থাকে এবং যে সম্বন্ধে কারণ কার্য্যে থাকে তাহার নাম সমবায়। পরস্পর একান্ত বিভিন্ন বস্তু অবিচ্ছিন্নভাবে যে সম্বন্ধে একত্র থাকে তাহাকেই বলে সমবায়। দ্রব্য এবং গুণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন অথচ গুণ দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তেমনি কর্ম্ম দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তেমনি সামান্য বা জাতি দ্রব্যগুণকর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে—যে সম্বন্ধে এই আশ্রয় নেওয়া সম্ভব হয় তাহাকে সমবায় বলে; সমবায় সংযোগ হইতে ভিন্ন। একজাতীয় দ্রব্যের পরস্পর যে মিলন হয় তাহাকে বলে সংযোগ; এই সংযোগ একটী গুণ।

দ্রব্য বলিতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্ (space), আত্মা এবং মন এই কয়টী পদার্থ বোঝায়। গুণ বলিতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথোক্ত, সংযোগ, বিভাগ এবং কোনো জাতীর অন্তর্ভূক্ত হওয়া বোঝায়; তাহা ছাড়া বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, অদৃষ্ট, গুরুত্ব, স্থিতি, স্থাপকত্ব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, প্রভৃতিকেও গুণ বলে। কর্ম্ম অর্থে গতি, এই গতি ঊর্দ্ধ-দিকে, অধঃদিকে বা সমান রেখায় ঘটিতে পারে এবং সঙ্কোচন এবং প্রসারণ ইহাও বুঝাইতে পারে। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, অনিত্য এবং কারণ ও কার্য্যরূপে এবং বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর জাতীর অন্তর্ভূক্ত হইতে পারে। দ্রব্য হইতে অন্য দ্রব্য হয় এবং গুণ হইতে অন্য গুণ হয়। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সমবায়ী কারণ। সমবায়ী কারণে অর্থাৎ উপাদান কারণে যাহা সমবায় সম্বন্ধ থাকে তাহা সেই কারণের কার্য্যের প্রতি অসমবায়ী কারণ, যেমন কাল মাটি লইয়া একটী কলসী নির্ম্মাণ করিলে, কলসীটীরও কাল রং হয়। কাল মাটিতে কাল রং ছিল সমবায়ী সম্বন্ধ সেইজন্য এই কাল রং যখন কলসের কাল রংয়ের কারণ হয় তখন এই কারণতাকে অসমবায়ী কারণ বলে। জাতী বা class concept তাহাকেই বলে যাহা অনেকের মধ্যে সমবায়

সম্বন্ধে থাকিয়াও এক, যেমন গোত্ব একটী জাতি, গোত্ব অর্থাৎ cowness যেমন সকল গরুর মধ্যেই সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়াও এক অর্থাৎ বিভিন্ন গরুতে যে গোত্ব আছে সেই গোত্বের মধ্যে পরস্পর কোনো পার্থক্য নাই। সত্ত্বা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম জাতি। ইহার মধ্যে অনেক অবান্তর জাতি রহিয়াছে যেমন দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি পরমাণু একরূপ হইলেও তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে বৈশিষ্ট আছে তাহাকে বিশেষ বলে। এই বিশেষ ধর্ম্ম কেবলমাত্র যোগীরা প্রত্যক্ষ করিতে পারে অথচ ইহাকে মানিতে হয়। আমাদের জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতির আশ্রয়রূপে আত্মা মানিতে হয়। এই সমস্ত গুণ বাদ দিলে আত্মা স্ব-স্বরূপে একান্ত নির্গুণ অর্থাৎ স্ব-স্বভাবে তাহার জ্ঞান, দুঃখ, সুখ কিছুই নাই। মুক্তিকালে আত্মা স্ব-স্বরূপে থাকে। মানস-প্রত্যক্ষের দ্বারা যেমন আত্মাকে বোঝা যায় তেমনি আত্মাকে অনুমানের দ্বারাও বোঝা যায়। বৈশেষিকদর্শনের মতে পূর্ব্বোক্ত ষট্ পদার্থের যথার্থ জ্ঞানের ফলে মোক্ষ হয়। অনুমান সম্বন্ধে বৈশেষিক দর্শনে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অতি সামান্য। ন্যায়দর্শনে তাহা বিস্তারিত করিয়া বলা হইয়াছে।

ন্যায় সূত্রে ষোড়শ পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে যথা—

প্রমাণ (যথার্থ জ্ঞানের উপায়), প্রমেয় (যথার্থ জ্ঞানের বিষয়), সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব (premises of an inference), তর্ক, নির্ণয়, বাদ (বিচার), জল্প (পরস্পর তর্কযুদ্ধ), বিতণ্ডা (যে কোন উপায়ে অপরের মত খণ্ডন করা), হেত্বাভাব (fallacy), ছল (quibble), জাতি (পরমত খণ্ডন), নিগ্রহ স্থান (যে যে বিষয়ে পবপক্ষ পরাজিত হইল তাহার নির্দ্দেশ), ন্যায়শাস্ত্রে লিখিত আছে যে এই গুলির যথার্থ জ্ঞান হইলে মুক্তি হয়। মিথ্যাজ্ঞান নানা রূপ দোষ উৎপন্ন করিয়া থাকে তাহার ফলে নানারূপ জন্ম প্রবৃত্তি হয় এবং তাহার ফলে হয় জন্ম এবং ভোগ করিতে হয় সংসারের দুঃখ। মিথ্যা জ্ঞান দূর হইলেও দোষ প্রবৃত্তি জন্ম ও দুঃখ ভোগ নিবৃত্ত হয় এবং তাহার ফলেই আসে মুক্তি বা অপবর্গ। যথাযথভাবে যুক্তি প্রয়োগ করিতে শিখিলে এই মিথ্যাজ্ঞান দূর হয় এবং তাহার ফলে ক্রমশঃ মুক্তি ঘটিতে পারে।

সাংখ্য ও যোগ সৎকার্য্যবাদী সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের ন্যূনাধিক্যে এবং গঠনের বৈচিত্রে সকল বস্তু নির্ম্মিত, কাজেই সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে, তবে কোনো বিশেষ বিশেষ দিকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রকৃতির বাধা নির্ম্মুক্ত হয় বলিয়া সেই সেই দিকে পরিণাম ঘটিয়া

থাকে। দুধ হইতে দধি হয়, কিন্তু পাথর হয় না। পাথর হইতে মুর্ত্তি হয়, কিন্তু দধি হয় না। এইজন্য বলা হয় যে, দধি দুধের মধ্যে শক্তিরূপে ছিল, কিন্তু পাথর ছিল না, তাই দুধ হইতে দধি হয়, কিন্তু পাথর হয় না। ইহাকে বলে পরিণাম-ক্রম-নিয়ম অর্থাৎ কোন বস্তু হইতে কোন বস্তু পরিণত হইতে পারে তাহার একটী অলঙ্ঘ নিয়ম আছে। যে বস্তুর মধ্যে যে বস্তু ছিল সেই বস্তু হইতে সেই বস্তু উৎপন্ন হয়। কারণ ব্যাপারের দ্বারা যাহা সূক্ষ্মভাবে ছিল তাহা প্রকাশ পায়, কিন্তু আরও সূক্ষ্মভাবে দেখিলে ইহা বলিতে পারা যায় যে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের মধ্যেই সকলবস্তু রহিয়াছে তাই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ন্যূনাধিক্যে ও গঠনবৈচিত্রে সকলবস্তুই নির্ম্মিত হইতে পারে। যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা দুধ নির্ম্মিত তাহাদের দধিরূপে পরিণত হওয়ার দিকের যে স্বাভাবিক বাধা ছিল তাহা ঈশ্বরের নিত্য ইচ্ছায় দূরীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তাই দুধ হইতে দধি হয় কিন্তু দুধের উপাদান-ভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পাথররূপে পরিণত হওয়ার যে বাধা রহিয়াছে তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছায় দূর হয় নাই, সেইজন্য দুধ হইতে পাথর হয় না—নচেৎ 'সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং' অর্থাৎ সকল বস্তুই সকল বস্তু অর্থাৎ উপযুক্ত বাধা দূর হইলে

সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তু হইতে পারে। এই বাধা দূর হওয়ার প্রণালীতেই Laws of Nature বা প্রকৃতির নিয়ম। এইখানে যোগমত ঈশ্বরের ইচ্ছা স্বীকার করিয়া সাংখ্যমতকে ব্যাপক করিয়াছে। সাংখ্যমতেও কারণ ও কার্য্যের সিদ্ধান্তটী মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাংখ্যমতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নাই তাই সেইমতে পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য প্রকৃতির যেরূপ পরিণাম হওয়া উচিৎ সেইরূপ পরিণামেই Laws of Nature. অন্যরূপ পরিণামও হইতে পারিত কিন্তু পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধির অনুকুল নয় বলিয়াই দুধ হইতে পাথর হয় না দধি হয়, কিন্তু ন্যায় মতে সৎকার্য্যবাদ স্বীকার করা হয় না। ন্যায়বৈশেষিক মতে প্রত্যেক পরমাণুরই একটী বৈশিষ্ট আছে, তাহাদের গুণ নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হয় না। যে কোনো বস্তু হইতে যে কোনো বস্তু নির্ম্মিতও হয় না। কার্য্য ও কারণের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে পূর্ব্বসিদ্ধ হইয়া নাই। উপাদানকারণ (যেমন ঘটের পক্ষে মাটি), নিমিত্তকারণ (কুম্ভকার), সহকারী কারণ (কুম্ভকারের চাকা এবং দণ্ড)— ইহাদের পরস্পরের ক্রিয়ায় মাটি হইতে ঘট উৎপন্ন হয়। মাটির মধ্যে ঘট সূক্ষ্মভাবে পূর্ব্বসিদ্ধ হইয়া ছিল না। সাংখ্য বলিতেন "নাগতো বিদ্যতে ভাবঃ" অর্থাৎ যাহা ছিল

না তাহা উৎপন্ন হইতে পারে না এবং "নাগরো বিদ্যতে মতঃ" অর্থাৎ যাহা ছিল তাহা ধ্বংস হইতে পারে না। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক বলেন যে যাহা ছিল না তাহাই যে উৎপন্ন হয় তাহা পূর্ব্বে ছিল না, মীমাংসকেরা বলিতেন যে কোনো বিশেষ শক্তিদ্বারা কারণ হইতে কার্য্য হয়। কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক এইরূপ কোনো অদৃশ্য শক্তি মানেন না। সাংখ্যমতেও কোনো অদৃশ্য শক্তি মানা হয় না। শক্তি এবং শক্তিমান (যাহার শক্তি আছে), গুণ এবং গুণী (যাহার গুণ আছে) উভয়েই সাংখ্যমতে এক ও অভিন্ন। ন্যায় মতে এই কথাই বলা হয় যে কারণ পূর্ব্বে থাকে, কার্য্য পরে হয়, কারণের মধ্যে অকারণ অনেক বস্তু মিশ্রিত থাকিতে পারে কাজেই যাহা থাকিলে কার্য্য হয় এবং যাহা না থাকিলে কার্য্য হয় না তাহাকেই কারণ বলা যায়। অনেক সময় কারণের সহিত এমন কিছু মিশ্রিত থাকে যাহা থাকিবার জন্য কার্য্য ঘটে। এই রকম বস্তুকে উপাধি বলে। ভিজা কাঠ হইতে আগুনও হয় ধূমও হয়। কাঠ ভিজা না থাকিলে ধূম হয় না, কাজেই কাঠের ভিজা থাকা একটা Condition বা উপাধি। কিন্তু আগুন হওয়ার প্রতি ভিজা থাকা কারণ নয়, কাজেই ভিজা থাকারূপ Condition বা উপাধিবর্জ্জিত যে কাঠ তাহা হইতে আগুন

হয়। আগুন থাকিলেই ধূম থাকে না, যেমন উত্তপ্ত লোহার 'বল্'। অতএব আগুন থাকিলেই ধূম থাকিবে বলা যায় না কিন্তু যথার্থ ধূম থাকিলেই আগুন থাকিবে। কুম্ভকারের দণ্ড কুম্ভের কারণ, কারণ দণ্ড দিয়া চাকা না ঘুরাইলে কুম্ভ তৈয়ারী করা যায় না। কিন্তু দণ্ডের রং কুম্ভের কারণ নয়। দণ্ডের রং কালোও হইতে পারে সাদাও হইতে পারে কাজেই কার্য্য উৎপাদনের প্রতি দণ্ডটীকে যে কালোই হইতে হইবে অথবা সাদাই হইতে হইবে ইহার কোনো নিয়ম নাই। তেমনি একটা কারণ হইতে যখন কতকগুলি কার্য্য ঘটে তখন সেই কার্য্যগুলির কোনটী অপরের প্রতি কারণ নয়, কারণ তাহারা মূল কারণেরই কার্য্য। দিনের পর রাত্রি হয় তথাপি দিন রাত্রির কারণ নয়, কারণ দিন রাত্রি উভয়েই সূর্য্যের আবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে। কুম্ভকারের চাকায় ঘট প্রস্তুত হওয়ার সময় শব্দ হয় সেইশব্দ ঘট প্রস্তুতের কারণ নয়। তাহা ছাড়া যে কারণগুলি সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যের সময় উপস্থিত থাকে তাহাকেও কারণ বলা যায় না যেমন আকাশ, বায়ু ইত্যাদি। কোনো কারণের কারণও কার্য্যের কারণ নয়, যেমন কুম্ভকারের পিতা কুম্ভের জনক কিন্তু কুম্ভের কারণ নয়। বস্তুতঃ মৃত্তিকার পরমাণুগুলির পরিস্পন্দ বা কম্পন হইতে ঘটের উৎপত্তি। ইহার

পশ্চাতে কোনো অদৃশ্যশক্তি নাই। কুম্ভকারের, চক্র এবং দণ্ড হইতে এই পরিস্পন্দ ঘটে সেইজন্য তাহাদিগকে ঘটের কারণ বলা হয়।

সাংখ্য বলেন যে ঈশ্বর মানিবার কোনো প্রয়োজন বা প্রমাণ কিছুই নাই। পুরুষের প্রয়োজন সাধনের জন্য প্রকৃতির অন্তর্নিহিত একটী প্রয়োজনানুসারিণী প্রবৃত্তির দ্বারা জাগতিক সমস্ত বাপার ব্যাখ্যা করা যায়, এইজন্য স্বতন্ত্রভাবে ঈশ্বর মানিবার কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা বলেন যে ঈশ্বর আপন ইচ্ছায় নিত্য-কালস্থায়ী পরমাণুগুলিকে তাঁহার ইচ্ছানুসারে চালিত ও মিলিত করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে, তেমনই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ ঈশ্বর, ঘটের যেমন মৃত্তিকা উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ কুম্ভকার, নৈয়ায়িকদের প্রতিবাদীরা বলেন যে কুম্ভকে যে হিসাবে কার্য্য বলা যায়, সাগর, ভূধর, নদী প্রভৃতি যুক্ত এই বিরাট পৃথিবীকে সেই হিসাবে কার্য্য বলা যায় না সেইজন্য ইহার কারণ আছে তাহাও বলা যায় না। নৈয়ায়িকেরা ইহার উত্তরে বলেন যে একটী কার্য্যের সহিত অপর কার্য্যের অনেক আকার প্রকারগত পার্থক্য থাকিতে পারে কিন্তু তাহাতে

কার্য্যকারণ সম্বন্ধে কোনো ব্যাঘাত ঘটে না। ধূম থাকিলেই সেখানে বহ্নি থাকে; বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়া ধূমের সহিত বহ্নির একটা অব্যভিচারী নিত্যসম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্ত করি তাহাকে বলি ধূমের সহিত বহ্নির ব্যাপ্তি অর্থাৎ যেখানে ধূম থাকে সেখানেই বহ্নি থাকে। কোনো জায়গায় হয়ত ধূমটা সোজা উঠিয়াছে, কোনো জায়গায় হয়ত কোঁকড়ান ধূম, কোনো জায়গায় গভীর কালো ধূম, কিন্তু তাহাতে ধূমের ধূমত্ব নষ্ট হয় না। কাজেই কার্য্যের আকার-প্রকারগত পার্থক্য থাকিলেও সকল কার্য্যের পিছনেই যে কারণ আছে একথা নিঃসংশয়-ভাবে মানিতে হয়। এইজন্য জগতের কারণ ঈশ্বরকে না দেখিলেও তাহার অস্তিত্ব মানিতে হয়। অনেকে বলে যে প্রত্যহ আমরা দেখি যে বীজ হইতে অঙ্কুর হয় অথচ সেই অঙ্কুরটা কে করিল তাহা আমরা দেখি না। নৈয়ায়িক বলেন যে না দেখিলেও মানিতে হইবে যে অঙ্কুরটার কোনো কর্ত্তা আছে, কারণ কার্য্য থাকিলেই কারণ আছে ইহা আমরা মানিয়া লইয়াছি। কেহ ইহা প্রমাণ করিতে পারে না যে অঙ্কুরের কোনো অদৃশ্য কর্ত্তা নাই। কারণ থাকিলেই যে সেই কারণে কোনো শরীর থাকিতে হইবে তা তাহার কোনো প্রমাণ নাই এইজন্য ঈশ্বর

জগতের কর্ত্তা হইলেই ইহা বলা যায় না যে সেই ঈশ্বরের কোনো দেহ আছে। এই ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞানবিশিষ্ট এবং কৃপালু। তিনি কর্ম্মফলের বিধাতা, তিনি পরমাণুদিগকে চালিত করিয়া কর্ম্মফল যেরূপে ভোগ করা যায় সেই অনুসারে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বেদ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি আমাদের পিতার ন্যায় এবং সর্ব্বদা আমাদের হিত সাধনে ব্যাপৃত আছেন।

জৈনেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বহু প্রমাণ দিয়াছেন এবং রামানুজও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা প্রমান করা যায় না কেবলমাত্র শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধার দ্বারাই ঈশ্বরকে জানা যায়। জৈনেরা প্রথম ইহাই দেখাইবার চেষ্টা করেন যে জগতকে কার্য্য বলা যায় না। যদি কার্য্য বলা যায় তবে তাহার কারণ যে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তাহাও প্রমাণ করা যায় না। কুম্ভকার যেমন কুম্ভের কর্ত্তা, তবে কুম্ভকারের যেমন দেহ আছে, জগতের কর্ত্তারও তেমনি দেহ থাকা আবশ্যক। দেহ না থাকিলে ইচ্ছা ও জ্ঞান থাকিতে পারে না। দেহের ব্যাপার না হইলে পরমাণুগুলির উপর শক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। যদি কর্ম্মফল ও তদনুযায়ী অদৃষ্ট অনুসারে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন তাহা হইলে

ঈশ্বর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নহেন। কোনো ব্যক্তি কোনো কাজ করিতে গেলেই কোনো না কোনো রকমের যন্ত্র প্রভৃতির আবশ্যক হয়। সেরূপ কোনো যন্ত্র যখন নাই তখন কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করিলেন। ঈশ্বর যদি কেবল চিন্ময় ও ইচ্ছাশক্তিময় হন তবে জগতের নানা অংশ সৃষ্টি করিবার জন্য তাঁহার বুদ্ধি ও ইচ্ছা নিশ্চয়ই নানা রূপ ধারণ করিয়াছিল। যদি তাহা করিয়া থাকে তবে ঈশ্বরকে অধিকারী বা অপরিবর্ত্তনীয় বলা যায় না। একই রকম বুদ্ধি দিয়া তিনি সৃষ্টি ও ধ্বংস উভয়ই করিতে পারেন না। আর যদি একটী ঈশ্বর মানা যায় তবে অনেকগুলি ঈশ্বর মানিলেই বা দোষ কি? অনেকগুলি ঈশ্বর একটী সমিতি বা পরিষদের সভ্যরূপে একযোগে নানারূপ কার্য্য করিতে পারেন। এইপ্রকার বহু যুক্তি দেখাইয়া জৈনরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; রামানুজ যে যুক্তিগুলি দেখাইয়াছেন তাহাও অনেক অংশে এই জৈনদের যুক্তির অনুরূপ।

ন্যায়শাস্ত্র প্রধানতঃ প্রমাণ-শাস্ত্র। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, নৈয়ায়িকেরা এই চারিটী প্রমাণ মানেন। ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষের স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া নৈয়ায়িকেরা প্রত্যক্ষজ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয় সে সম্বন্ধে

অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তবে অনুমান সম্বন্ধে খৃষ্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম শতক হইতে নৈয়ায়িকেরা যে আলোচনা আরম্ভ করেন, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ শতক পর্য্যন্ত সেই আলোচনা নানারূপ সূক্ষ্ম বিচারে ও সেই সমস্ত সূক্ষ্ম কথার সুস্পষ্ট প্রকাশের জন্য নানারূপ পারিভাষিক ভাষা সৃষ্টি করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের ভাষাকে অন্য সমস্ত দর্শনের পারিভাষিক ভাষারূপে গৃহীত হইবার সুযোগ দেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নব্যযুগে এই প্রমাণ বিচারই নব্য ন্যায়রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রমাণের কথা বলিতে গিয়া নৈয়ায়িকেরা বলেন যে সকল কার্য্য যেমন নানাকারণের একত্রীকরণে উৎপন্ন হয় জ্ঞানও তেমনি নানা কারণের একত্রীকরণে উৎপন্ন হয়, এই কারণের একত্রীকরণকে সামগ্রী বলে। জ্ঞানের বেলা বাহ্যকারণ ও আন্তরকারণ (যথা মনের ব্যাপার, স্মরণ প্রভৃতি) একত্র যুক্ত হইয়া প্রত্যক্ষ যাহা দেখি তাহাকে অন্য জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া জ্ঞানকে ক্রমশঃ স্পষ্টতর করিয়া তোলে। অনুমান এবং শব্দের বেলাও এইরূপ বাহ্য ও আন্তরকারণের একত্র সম্মিলনে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাংখ্যেরা বলিতেন যে পুরুষের চিৎ-প্রতিবিম্বে জ্ঞান হইয়া থাকে। একথা নৈয়ায়িকেরা

মানেন না। এরূপ জ্ঞান মানিতে গেলে প্রায় সমস্ত জ্ঞানকেই ভ্রান্ত মনে করিতে হয়, ভ্রম ও সংশয় বর্জ্জিত যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সহিত বস্তুর সংস্পর্শে ঘটিয়া থাকে তাহাকেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান কহে। এই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান যখন প্রথম উৎপন্ন হয় তখন কেবলমাত্র বস্তুটীরই জ্ঞান হয়, তাহার কোনো গুণ বা নাম বা তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কিছুরই বোধ হয় না। এইরূপ জ্ঞানকে নির্ব্বিকল্প জ্ঞান বলে, কিন্তু এই জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পর ক্রমশঃ তাহার গুণ, তাহার নাম ও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য অনেক কিছুরই বোধ হইতে পারে। এইরূপ জ্ঞানকে সবিকল্প-জ্ঞান বলে। নির্বিকল্প জ্ঞানটী এত অস্পষ্ট যে সেই জ্ঞান হইবার সময় তাহার সম্বন্ধে কোনরূপ স্পষ্টতাই থাকে না। নির্ব্বিকল্প-জ্ঞান হওয়ার পর ক্রমশঃ সেই জ্ঞানটী স্পষ্টতর হইয়া ওঠে। এই অস্পষ্ট হইতে স্পষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটীই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের ব্যাপার বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের সহিত সংস্পর্শের পর হইতে যে পর্য্যন্ত না জ্ঞানটী সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়, সেই সমস্তই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের কাজ। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। যাঁহারা বিস্তৃতভাবে জানিতে চাহেন তাঁহারা আমার History of Indian

Philosophy-র প্রথম খণ্ড অনুসন্ধান করিবেন। অনুমান সম্বন্ধে নৈয়ায়িকেরা অতি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাহাও ওই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে যৎসামান্যভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

ন্যায়মতে আত্মা সর্ব্বব্যাপী। ইহার কোনো গুণ নাই। মনের সহিত এবং মনের দ্বারা বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি নানা গুণ আত্মায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। আত্মা যথার্থত দেহের সম্বন্ধ নয় তথাপি দেহ এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ আত্মায় উৎপন্ন হইতে পারে না। মুক্তি হইলে আত্মার, দেহের ও মনের সহিত সম্পর্ক থাকে না, কাজেই সে অবস্থায় আত্মার কোনো গুণ থাকে না। সাংখ্যেরা যেমন সংসারকে দুঃখময় বলিয়া মনে করেন এবং দুঃখনাশের জন্যই দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন, নৈয়ায়িক অনেকটা সেইরকম বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। মিথ্যা জ্ঞানের জন্যই আমাদের বন্ধন। এই মিথ্যা জ্ঞান, যথার্থ প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা এবং বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা দূর হইয়া যায়। আমরা বুঝিতে পারি যে যাহাকে আমরা সুখ বলিয়া মনে করি তাহা দুঃখ মিশ্রিত এবং

সেইজন্য সুখের লালসা হইতে আমাদের মনকে আমরা মুক্ত করিতে পারি। মিথ্যা জ্ঞান ধ্বংস হইলে রাগ দ্বেষ থাকে না এবং রাগ দ্বেষ না থাকিলে কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না। কর্ম্ম সঞ্চয় না হইলে কোনো পাপপুণ্য হয় না এবং কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে মানুষ মুক্তি লাভ করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মুক্তি অবস্থায় আত্মার কোনো জ্ঞান থাকেনা, কোনো সুখ দুঃখ থাকে না।

লোকায়ত, নাস্তিক বা চার্ব্বাক দর্শন—এতক্ষণ আমরা আস্তিকদর্শনের কথা বলিতেছিলাম। আস্তিক দর্শনের কথা মানে যাহারা বেদের প্রামাণ্য মানেন। এখন যাহারা বেদের প্রামাণ্য মানে না তাহাদের কথা বলিব। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে লিখিত আছে যে একদল দার্শনিক ছিলেন যাঁহারা পঞ্চভূতকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতেন। লোকায়ত নামটী প্রাচীন। অর্থশাস্ত্রে এই নামটী পাওয়া যায়। বুদ্ধঘোষ লোকায়ত নামটী করিয়াছেন। ইহারা নাকি অপরের মত খণ্ডন করিতে বিশেষ পটু ছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থের নানাস্থানে লোকায়তদের নাম পাওয়া যায়। যে মত সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তৃত তাহাকে লোকায়ত বলে। ইহার আর একটী অর্থ এই, যে মত অবলম্বন করিলে লোকে উন্নতির দিকে উৎসাহ হইতে পারে তাহাকেই

লোকায়ত বলে। এই লৌকায়ত মতকে অনেক সময় নাস্তিক-শাস্ত্র বলা হয়।' মনুর মেধাতিথির ভাষ্য পড়িলে দেখা যায় যে তর্কবিদ্যায় পটু বলিয়া ইহাদের খ্যাতি ছিল। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে পাতঞ্জলির ভাষ্য হইতে জানা যায় যে ভাগুরি লোকায়ত শাস্ত্রের একটি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে কাত্যায়ণ কৃত বার্ত্তিকে এই ব্যাখ্যাটির নাম বর্ণিকা বলিয়া বলা হইয়াছে। কমলশীল, প্রভাচন্দ্র, জয়ন্ত এবং গুণরত্ন প্রভৃতিরা এই লোকায়ত বা চার্ব্বাক দর্শন হইতে কতকগুলি সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। কমল-শীল দুইজাতীয় চার্ব্বাকের কথা বলিয়াছিলেন: ধূর্ত্ত চার্ব্বাক ও সুশিক্ষিত চার্ব্বাক। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহেও (চতুর্দ্দশ শতকে) চার্ব্বাক দর্শন সম্বন্ধে বর্ণনা রহিয়াছে। মহাভারতে চার্ব্বাক-দিগকে হেতুবাদী বলিয়া বলা হইয়াছে, কাজেই দেখা যাইতেছে যে চার্ব্বাক-মত খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ,- পঞ্চম শতক অথবা তার পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। ইহারা আত্মার অস্তিত্ব বা অমরত্ব স্বীকার করিতেন না। পরকাল বা জন্মান্তর মানিতে না। এবং বেদ বা স্মৃতির কোনো প্রামাণ্য মানিতেন না। যুক্তি অবলম্বন করিয়া বেদমতকে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেন বলিয়া মনু প্রভৃতিরা ইহাদের অনেক নিন্দা করিয়াছেন। মৃত্যুর পর আর কোনো

চৈতন্য বা আত্মা থাকে না, এরূপ একটি মত বৃহদারণ্যক উপনিষদেও দেখা যায় (নবা অরে প্রেত্যসংজ্ঞা অস্তি ইতি)। এইমত লইয়া মহাভারতে অনেক আলোচনা হইয়াছে। চার্ব্বাকদের ন্যায় অজিত কেশকম্বলীও কোনো যজ্ঞ দান প্রভৃতি যে পূণ্য কার্য্য তাহা মানিতেন না। ইহকাল, পরকাল, কর্ম্মফল বা জন্মান্তর মানিতেন না। চার্ব্বাকদের ন্যায় তিনিও বলিতেন যে পঞ্চভূতাত্মক এই দেহ ছাড়া ইহার অভ্যন্তরে কোনো আত্মা নাই। পণ্ডিত এবং মূর্খ উভয়েই দেহ নাশের সঙ্গেই বিলীন হইয়া যান। এই অজিত কেশকম্বলীর কথা দীঘনিকায় বর্ণিত আছে। মঘলি-পুত্র গোশাল মহাবীরও বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি আজীবক সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। অশোকবংশীয় দশরথ ইহাদের উদ্দেশ্যে গয়ার নিকটবর্ত্তী বরবর পাহাড়ে খৃষ্ট পূর্ব্ব ২২৭-এ একটি গুহা নিবেদন করেন। ইঁহারা বলিতেন যে মানুষের সুখ দুঃখ ভোগের কোনো কারণ নাই, কোন কর্ম্মফল নাই, কোনো পুরুষকার নাই। একটা স্বাভাবিক নীতিতে মানুষ ও সর্ব্ব প্রাণীর পরিণাম হইয়া থাকে। গোশাল বলিতেন সন্ন্যাসী হইয়া স্ত্রীসঙ্গ করিলে কোনো ক্ষতি নাই। আজীবকেরা কর্ম্মফল মানিতেন না। তাঁহারা বলিতেন যে ছাগলের

জল খাওয়াও যে রকম স্বাভাবিক, স্ত্রীসঙ্গও সেইরূপ স্বাভাবিক। সূত্র-কৃতাঙ্গ সূত্রের টীকায় শীলাঙ্ক এক-জাতীয় নাস্তিকদের কথা বলিয়াছেন যে তাঁহারা বলিতেন যে দেহের মধ্যে দেহ ছাড়া সুখ দুঃখ উপভোগ করিতে পারে এমন কোনো আত্মা নাই, এবং ভাল কর্ম্ম, মন্দ কর্ম্ম বলিয়া কোন কর্ম্মের ভেদ নাই। ইহাদিগকে প্রগল্ভ-নাস্তিক বলা হইত। ইহারা নানারূপ সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ করিয়া নানারূপ অনাচার করিতেন। ছান্দোগ্য উপনিষদেও দেহাত্মবাদী বিরোচনের কথা উল্লিখিত আছে। রামায়ণে জাবালী ঋষিও চার্ব্বাক মতের প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন যে শ্রাদ্ধ করিলে যদি পরলোকে আত্মার তৃপ্তি হয় তবে লোক বিদেশে গেলে তাহাদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করিলে তাহাদের তৃপ্তি হইতে পারে। বিদেশে বসিয়া তাহাদের আহার সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন নাই। তপস্যা, যাগ, যজ্ঞ, দক্ষিণা প্রভৃতি সমস্তই নিরর্থক। চার্ব্বাক নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন কিনা বলা যায় না। অনেকে বলেন যে চারুবাক্ হইতে চার্ব্বাক হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহারা মিষ্ট কথা বলিতেন তাঁহারা ছিলেন চার্ব্বাক। দেখা যাইতেছে যে যাঁহারা চার্ব্বাক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁহারা ছাড়াও অন্য অনেকে চার্ব্বাকজাতীয়

মত পোষণ করিতেন। এই চার্ব্বাক মতাবলম্বীরা প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ মানিতেন না। পুরন্দর নামে চার্ব্বাকের এক শিষ্য ছিলেন ; তিনি বলিতেন যে প্রত্যক্ষতঃ যাহা দেখা যায় তাহা অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত অনুমান করা হয় তাহার প্রামাণ্য আছে কিন্তু অপ্রত্যক্ষ বস্তু সম্বন্ধে কোনো অনুমানের দ্বারা সত্য সিদ্ধান্তে আসা যায় না। ধূর্ত্ত চার্ব্বাকেরা বলিতেন দেহ ছাড়া কোনো আত্মা নাই, কিন্তু সুশিক্ষিত চার্ব্বাকেরা বলিতেন যে দেহজ ব্যাপারের ফলে একটী রাসায়নিক বিকারের ন্যায় কোনো একটী চৈতন্য উৎপন্ন হইলেও দেহান্ত হইলে তাহার কোনো সত্বা থাকে না। চার্ব্বাকেরা কোনো ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়ম মানিতেন না।

জৈন দর্শন—অনেকে মনে করেন জৈন ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই একটা অঙ্গ। অনেকে বা ইহাও মনে করেন যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং জৈন ধর্ম্ম সমসাময়িক ; কিন্তু ইহা সত্য নহে। অতি প্রাচীন বৌদ্ধ-সাহিত্যেও জৈন বা নিগন্থদের উল্লেখ পাওয়া যায়। জৈনদের শেষ তীর্থঙ্কর ছিলেন নাতপুত্ত বর্দ্ধমান মহাবীর। মহাবীর ছিলেন বুদ্ধের সমসাময়িক। কিন্তু মহাবীর জৈন ধর্ম্ম বা দর্শনের প্রণেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন জৈন সন্ন্যাসীমাত্র। তাঁহার পূর্ব্বের তীর্থঙ্কর ছিলেন পার্শ্ব। তিনি মহাবীরের

২৫০ বৎসর পূর্ব্বে দেহরক্ষা করেন। পার্শ্বের পূর্ব্বে ছিলেন অরিষ্টনেমী। জৈন কাহিনীতে বলে যে তিনি মহাবীরের নির্ব্বাণের আশী হাজার বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হন। এই সমস্ত কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না তবে সম্ভবতঃ পার্শ্ব একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। ইহা হইতে এটুকুও বোঝা যায় যে জৈন ধর্ম্ম অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। জৈন ধর্ম্ম কত প্রাচীন তাহা নির্ণয় করিয়া বলা যায় না। জৈনেরা বলেন যে জৈন ধর্ম্ম প্রতি সৃষ্টিতে নব নব ভাবে আবির্ভূত হইয়াছে। বর্ত্তমান সৃষ্টিতে ঋষভদেব ছিলেন আদি তীর্থঙ্কর এবং বর্দ্ধমান মহাবীর ছিলেন চতুর্বিংশতিতম শেষ তীর্থঙ্কর, তীর্থঙ্কর শব্দের অর্থ দর্শন-কর্ত্তা। জৈনদের মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী আছে। এক সম্প্রদায়ের লোকেরা শ্বেতবস্ত্র পরেন, তাহাদের বলে শ্বেতাম্বর। অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা থাকেন উলঙ্গ, তাহাদের বলে দিগম্বর। দিগম্বর, শ্বেতাম্বরদের মধ্যে আচারগত বৈষম্য আছে। দিগম্বরেরা বলেন যে আদিম জৈন গ্রন্থগুলি মহাবীরের পরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এইজন্য শ্বেতাম্বরেরা যে সমস্ত গ্রন্থকে মূল আগম বলিয়া স্বীকার করেন দিগম্বরেরা সেগুলিকে স্বীকার করেন না। শ্বেতাম্বরেরা বলেন যে খৃষ্টীয় ৮৩ অব্দে

শিবভূতি দিগম্বর সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। আবার দিগম্বরেরা বলেন যে তাঁহারাই প্রাচীনতম জৈন সম্প্রদায়। তাঁহারা বলেন যে মহাবীরের পরবর্ত্তী অষ্টম তীর্থঙ্কর ভদ্রবাহুর সময় একটী জৈন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই সম্প্রদায়, জৈন আচার প্রতিপালনে অনেকটা পরিমাণে শিথিল ছিলেন। ইহাদের নাম ছিল অর্দ্ধপালক। ইহাদের মধ্য হইতেই খৃষ্টীয় ৮০ শতকে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় উৎপন্ন হয়। দিগম্বর শ্বেতাম্বরের মধ্যে মূল দর্শনতত্ত্বের কোনো ভেদ নাই, তবে আচারগত অনেক বৈষম্য আছে। পরবর্ত্তীকালে এই জৈনেরা প্রায় ৮৪টী শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে আচারের যৎসামান্য পার্থক্য আছে। এই শাখা-গুলিকে গচ্ছ বলে। এই শাখাগুলির মধ্যে খরতর গচ্ছই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই গুরু পরম্পরার সূচী (list) আছে। এই সূচীগুলিকে বলে স্থবিরাবলী, পট্টাবলী বা গুর্ব্বাবলী। কল্পসূত্র এবং হেমচন্দ্রের পরিশিষ্ট পর্ব্বে ইহাদের সম্বন্ধে অনেক কাহিনী বর্ণিত আছে।

প্রাচীন জৈন গ্রন্থ দুইটী ভাগে বিভক্ত। কতকগুলিকে বলে পূর্ব্ব এবং কতকগুলিকে বলে অঙ্গ। ১৪টী পূর্ব্ব আছে এবং ১১টী অঙ্গ আছে। পূর্ব্বগুলি আর এখন

পাওয়া যায় না। অঙ্গগুলির নাম এইরূপ :—আচার, সূত্রকৃত, স্থান, সমবায়, ভগবতী, জ্ঞাত ধর্ম্মকথা, উপাসক দশা, অন্তঃকৃত দশা, অনুত্তরোপপত্তিক দশা, প্রশ্ন ব্যাকরণ, বিপাক, ইহা ছাড়া বারটী উপাঙ্গ আছে। তাহা ছাড়া দশটী প্রকরণ আছে। ৪টী মূল সূত্র আছে, যথা উত্তরাধ্যয়ণ সূত্র, আবশ্যক, দশবৈকালিকা, পিণ্ডনির্যুক্তি। দিগম্বরেরা এই সমস্ত গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। এই সমস্ত আগম গ্রন্থ অর্দ্ধমাগধী প্রাকৃতে লেখা। কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ অর্দ্ধমাগধী নয়। সেইজন্য এই ভাষাকে জৈন প্রাকৃত বা জৈন মহারাষ্ট্রী ভাষা বলা হয়। এই সমস্ত গ্রন্থের উপর অনেক টীকা টিপ্পনী লেখা আছে। ইহা ছাড়া অনেকে অনেক ভাবের প্রকরণ গ্রন্থ লিখিয়াছেন, যেমন, উমাস্বাতির তত্ত্বার্থাদিগমসূত্র (খৃষ্টীয় প্রথম শতক); বিশেষ আবশ্যক ভাষ্য, জৈন-তর্কবার্ত্তিক, নেমীচন্দ্র কৃত দ্রব্যসংগ্রহ (দ্বাদশ শতক), মল্লিসেন কৃত স্যাদ্বাদমঞ্জরী (ত্রয়োদশ শতক), সিদ্ধসেন দিবাকর কৃত ন্যায়াবতার (ষষ্ঠ শতক), অনন্তবীর্য্য কৃত পরীক্ষামুখসূত্র লঘুবৃত্তি (একাদশ শতক), প্রভাচন্দ্রকৃত প্রমেয়-কোমলমার্ত্তণ্ড (নবম শতক), হেমচন্দ্র কৃত যোগশাস্ত্র (দ্বাদশ শতক), দেবসূরি কৃত প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার (দ্বাদশ শতক),

ইহা ছাড়া আরও বহু জৈনগ্রন্থ মুদ্রিত ও অমুদ্রিত অবস্থায় আছে।

বেদান্তীরা বলিতেন যে মৃত্তিকা হইতে ঘট হয় এবং আরও অন্যান্য বস্তু হয়, কিন্তু মৃত্তিকাই একমাত্র সৎ আর সমস্তই কেবলমাত্র নামরূপ। ইহাদের তাত্ত্বিকবস্তু মৃত্তিকা, মৃত্তিকার আর সমস্ত বিকারই মিথ্যা। বৌদ্ধেরা কোন স্থায়ীবস্তু মানেন না। সমস্তই ক্ষণস্থায়ী প্রতীতি মাত্র। কিন্তু জৈনেরা বলেন যে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই কতকগুলি অংশ স্থায়ী। আবার প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্ম নূতন সংক্রান্ত হয় এবং কতকগুলি ধর্ম্ম ধ্বংস হয়। যদিও কতকগুলি গুণের সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন হয় তথাপি সকল গুণ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হয় না। মৃত্তিকার কতকগুলি গুণ ধ্বংস পাইয়া ঘট উৎপন্ন হয় আবার ঘটের মধ্যে কতকগুলি নূতন গুণ দেখা যায়। ঘটে যে কাজ হয় মৃত্তিকায় সে কাজ হয় না। কতকগুলি গুণ থাকে ধ্রুব বা স্থায়ী, কতকগুলি হয় উৎপন্ন এবং কতকগুলি প্রায় ধ্বংস। সকল বস্তুই দ্রব্য, উৎপাদ এবং ব্যয়যুক্ত। (ইহা হইতেই জৈনদের অনেকান্তবাদের সৃষ্টি। একান্ত তাহাকেই বলে যাহা একভাবে থাকে, অনেকান্ত অর্থ যাহা একভাবে থাকে না, অর্থাৎ কোনো কিছুকেই আমরা একান্তভাবে স্থির বলিতে

পারি না, একান্তভাবে ধ্বংস হয় তাহাও বলিতে পারি না। আবার একান্তভাবে উৎপন্ন হয় তাহাও বলিতে পারি না। একটী ঘটকে পরমাণুপুঞ্জ হিসাবে দ্রব্য বলিতে পারি, কিন্তু তাহার মধ্যে যে শূন্যতা (space) আছে তাহা আকাশ সেই হিসাবে তাহাকে দ্রব্য বলা যায় না, কাজেই ঘট দ্রব্যও বটে দ্রব্য নয়ও বটে। ঘট পার্থিব পরমাণুর পুঞ্জ হিসাবে পরমাণু, কিন্তু জলীয় পরমাণু হিসাবে বা স্বর্ণের পরমাণু হিসাবে পরমাণু নয়। কাজেই এক হিসাবে যাহাকে একটি আখ্যা বা নাম দেওয়া যায় অন্য হিসাবে তাহাকে সে নাম দেওয়া যায় না। এইভাবে বিচার করিলে প্রত্যেক বস্তুর ভিতরেই অনন্ত রহিয়াছে। দরিদ্রকে ধনী বলা যায় না তথাপি ধনের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে তাই সে ধনহীন। কাজেই কোনো না কোনো সম্বন্ধে ধরিলে প্রত্যেক বস্তুর সহিতই প্রত্যেক বস্তুর সম্বন্ধ রহিয়াছে। আবার অন্যবস্তুর দিক্ দিয়া দেখিলে হয়ত সে সম্বন্ধ নাই। কোনো বিষয় সম্বন্ধেও কোনো কথা বলিতে গেলে দেখা উচিত কি হিসাবে সেই বিষয় সম্বন্ধে সেই কথা বলা যায়। যখন আমরা বলি ইহা একখানি বই, তখন সেই বস্তুটার অন্য সমস্ত দিক উপেক্ষা করিয়া তাহাকে পড়া যায় এই দিক দিয়া দেখি। তেমনি সেখানে সাদা কি কালো

এই সব দিক দিয়াও সেই বই সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিতে পারি। আবার পরমাণুপুঞ্জ হিসাবে দেখিতে গেলে তাহাকে কেবলমাত্র দ্রব্য বলি। আমরা বলিতে পারি যে আমরা বই পড়িতেছি অথচ তখন হয়ত আমরা পড়িতেছি বইয়ের একটী পংক্তি বা শব্দ। এই রকম বিভিন্ন দিক্ দিয়া দেখিয়া প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে আমরা বিভিন্ন রকমের আলোচনা করিতে পারি। এই রকম বিভিন্ন দিক্ থেকে দেখার নাম ন্যয়। যখন আমরা একটা বস্তুকে কেবলমাত্র তাহার সত্তার দিক থেকে দেখি তখন সেই রকম দেখাকে বলে সংগ্রহ-ন্যয়। বেদান্তীরা এই দৃষ্টিতে দেখে থাকেন তাই তাঁরা বলেন যে সকল বস্তুই সংস্বরূপে এক। যখন কোন বস্তুকে আমাদের ব্যবহারিক দৃষ্টিতে দেখি অর্থাৎ তাহার সমস্ত গুণের সহিত তাহাকে একত্র করিয়া দেখি অর্থাৎ গুণগুলিকে বস্তুরই একটা স্বরূপ বলিয়া মনে করি তখন তাহাকে বলে ব্যবহার-ন্যায়; আবার যখন কোনো বস্তুকে বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতের হিসাব না করিয়া কেবলমাত্র কোনো মুহূর্ত্তের গুণসমষ্টিরূপে দেখি, মনে করি যে প্রতি মুহূর্ত্তেই কতকগুলি নূতন গুণ একত্র সমাবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহা পরিবর্ত্তিত হইতেছে তখন সেই দৃষ্টিকে বলা যায়

পর্য্যায়ন্যায় বা ঋজুসূত্র-ন্যায়। বৌদ্ধেরা এই দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। ন্যায় অর্থে দৃষ্টিভঙ্গী। বেদান্ত, সাংখ্য, বৌদ্ধ প্রভৃতিরা এক একটা দৃষ্টি-ভঙ্গীকেই চরম দৃষ্টিভঙ্গী বলিয়া মনে করিয়াছে। সেইজন্য তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ভ্রান্ত। এইরূপ ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীকে ন্যয়াভায বলে। বস্তুতঃ, প্রত্যেকটী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারাই বস্তুর এক একটী যথার্থ রূপ প্রকাশ পায়, ইহাদের কোনোটীকে একান্তভাবে সত্য মানিয়া অপরগুলিকে উপেক্ষা করিলে আমাদের জ্ঞান ভ্রান্ত হয়। এইজন্য প্রত্যেকটী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গেই "হইতে পারে" অর্থাৎ স্যাৎ এই কথাটী বসাইয়া ইহা বুঝাইয়া দিতে হয় যে ইহা বা এই রকমের নিশ্চয় যেমন সত্য হইতে পারে তেমন অপর রকমের নিশ্চয়ও সত্য হইতে পারে অর্থাৎ প্রত্যেকটী নিশ্চয় আপেক্ষিক, অর্থাৎ কোনো দৃষ্টিতে দেখিলে এইবস্তু এইরূপ, আবার অপর দৃষ্টিতে দেখিলে ইহা অন্যরূপ। কোনো বস্তু সম্বন্ধে এরূপ কোনো নিশ্চয় করা যায় না যে ইহা এইরূপই অন্যরূপ নয়। এইভাবে দেখার নাম ন্যয়বাদ ইহা হইতেই জৈনদের প্রসিদ্ধ স্যাৎবাদের উৎপত্তি। স্যাৎবাদের বক্তব্য মূল কথাটী এই যে, যে কোনো বস্তু সম্বন্ধেই আমরা যাহা কিছু বলি না কেন তাহা যে কেবল তাহাই, তাহা বলা যায় না। তাহা

"হইতে পারে সেইরূপ", তাহা "হইতে পারে সেরূপ নয়", তাহা "হইতে পারে সেরূপও বটে সেরূপ নয়ও বটে", "হইতে পারে তাহা সম্বন্ধে কিছু নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না", "হইতে পারে ইহাও বটে ইহা সম্বন্ধে কিছু নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা যায়ও না বটে", "হইতে পারে ইহা নয়ও বটে, ইহা সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা যায়ও না বটে" (হইতে পারে ইহাও বটে, ইহা নহেও বটে এবং ইহা সম্বন্ধে কিছু নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা যায়ও না বটে)। সংস্কৃতে এই বিভিন্ন বৈকল্পিক উক্তিকে এইভাবে বলা হয় (১) স্যাদস্তি, (২) স্যান্নাস্তি, (৩) স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, (৪) স্যাদবক্তব্য, (৫) স্যাদস্তি চাবক্তব্যশ্চ, (৬) স্যাৎনাস্তি চাবক্তব্যশ্চ, (৭) স্যাদস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ, ইহাকে বলা হয় সপ্তভঙ্গি-ন্যায় অর্থাৎ সাত রকম কোনো বস্তু সম্বন্ধে কোনো কথা বলিবার নিয়ম। ইহাদের প্রত্যেকটী আপেক্ষিকভাবে সত্য। কোনো বিশেষ দিক্ হইতে দেখিলে কোনো বস্তু সম্বন্ধে কোনো কথা সত্য বলিয়া বলা যায়, আবার অন্য দিক হইতে দেখিলে তাহা সত্য নয় বলিয়া বলা যায় ইত্যাদি। একটী ঘর সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে ইহা আছে কিন্তু তাহার সম্বন্ধে আমরা আবার বলিতে পারি যে ইহা ঘটরূপেই

আছে। ইহা পুস্তকরূপে নাই, ঘটরূপে থাকাই পুস্তক-রূপে না থাকা। কাজেই আমরা ইহাও বলিতে পারি যে ইহা যেমন ঘটরূপে আছে তেমন পুস্তকরূপে নাই, আবার ঘট ও ঘট ভিন্ন অন্য সকলরূপে ইহা নাই এই 'হ্যাঁ' ও 'না' এর মধ্যবর্ত্তী কোনো স্বরূপেই ইহাকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না এইজন্য ইহা অবক্তব্য। এইভাবে প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে যাহা কিছু আমরা বলিনা কেন তাহাই আপেক্ষিক-ভাবে সত্য। একেবারেই ইহাই অমুক আর কিছু কোন-ভাবেই নয় এরূপ ভাবে কোন বস্তু সম্বন্ধেই কোন কথা বলা যায় না। জৈনেরা বলেন যে অন্য অন্য মতের দার্শনিকেরা কোনো জগতের বস্তুতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া 'ইহা ইহাই' এবং 'ইহা উহা নয়' এইরূপ একান্তভাবে নির্দ্দেশ করিতে গিয়া মহা ভ্রমে পড়িয়াছেন। বস্তুতঃ, বিভিন্ন দিক হইতে দেখিলে কোনো কথাই একান্তভাবে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ইহাই স্যাৎবাদের তাৎপর্য্য। এইজন্য ইহাকে স্যাৎবাদ বা অনেকান্তবাদ বলা হইয়াছে।)

জ্ঞানের কথা বলিতে গিয়া নৈয়ায়িকদের (ন্যায় জৈনেরা বলেন যে এই সংসারে আমরা নিরন্তর আমাদের নানারূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ব্যাপৃত থাকি। জ্ঞান না হইলে আমরা আমাদের প্রয়োজনানুরূপ কার্য্য করিতে পারি না।

প্রয়োজনানুরূপ কার্য্য করিবার জন্য যথার্থ জ্ঞানের একান্ত আবশ্যকতা, এইখানেই জ্ঞানের যথার্থ মূল্য, নৈয়ায়িকেরা আরও বলিয়াছেন যে জ্ঞান হইলেই সেই জ্ঞানকে আমরা বিশ্বাস করি না। বাহিরের কাজে প্রবৃত্ত হইয়া যখন আমরা দেখি যে আমাদের অন্তরে যেরূপ জ্ঞান হইয়াছিল বাহিরের বস্তুও ঠিক সেইভাবেই আছে তখনই সেই জ্ঞানকে আমরা সত্য বলিয়া মানি। ইহাকেই বলা যায় জ্ঞানের পরতঃ প্রামাণ্য, অর্থাৎ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই জ্ঞানকে সত্য বলিয়া মানি না (যেমন বেদান্তীরা তাহাদের স্বতঃ প্রামাণ্যবাদমতে বলেন) ; কিন্তু জ্ঞানের ইঙ্গিত অনুসারে বাহিরের জগতে প্রবৃত্ত হইয়া যখন দেখি যে জ্ঞানের ইঙ্গিতে যাহা দেখিয়াছিলাম বাহিরে তাহাই রহিয়াছে তখনি সেই জ্ঞানকে সত্য বলি। জৈনেরা বলেন যে রজ্জুতে আমাদের সর্প ভ্রম হয়। রজ্জুও সত্য সর্পও সত্য, কিন্তু যেখানে রজ্জু আছে সেখানেই সর্প রহিয়াছে মনে করিলে তবেই হয় ভ্রম। জ্ঞান যখন বাহিরের জগতের কার্য্যে আমাদের প্রবৃত্তিকে সফল করিতে অবসর দেয় তখনই সেই জ্ঞানকে আমরা প্রমাণ বলিয়া মানি। কেমন করিয়া জ্ঞান উৎপন্ন হইল এই বিচার একান্ত নিরর্থক। কোন কোন বিশেষ অবস্থায় আমাদে

ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়া যখন বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞান হয় এবং সেই জ্ঞান অনুসারে বহির্লোকে আমাদের প্রয়োজনানুসারে কাজ করিতে পারি তখন সেই জ্ঞানকে আমরা সমাদর করি। নৈয়ায়িকেরা বলেন যে জ্ঞানের উৎপত্তির প্রথম ক্ষণে বস্তু সম্বন্ধে একটা নির্বিকল্প বা অস্ফুট ধারণা হয়, পরে স্মৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ সেই জ্ঞান স্ফুট হইয়া ওঠে। কিন্তু জৈনেরা ইহা মানেন না, কারণ জ্ঞান কোন সময় অস্ফুট ছিল না। পরে ক্রমশঃ অস্ফুট হইল ইহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। হঠাৎ কোনো সময় কোনো বিষয়ে আমাদের জ্ঞান প্রকাশিত হয় তখন আমরা বলি ইহা আমরা দেখিলাম, ইহাছাড়া জ্ঞান কেমন করিয়া উৎপন্ন হইল এই সম্বন্ধে নানারূপ কূট আলোচনা নিষ্ফল।

প্রত্যক্ষের কথা বলিতে গিয়া জৈনেরা বলেন যে পাঁচটী স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় বা মন মানিবার কোনো প্রয়োজন নাই কারণ এই সকল ইন্দ্রিয় বা মনকে আমরা কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা পাই না। হঠাৎ একটী ফুল দেখিতেছি বলিয়া বোধ হইল বা গরম লাগিতেছে বলিয়া বোধ হইল, এস্থলে পুষ্পদর্শন বা উত্তাপ বোধ এইটীই আমরা প্রত্যক্ষ করি। কাজেই আমরা বলিতে পারি যে এই সমস্ত জ্ঞানই

আত্মার মধ্যে আবৃত হইয়াছিল, সে আবরণ হঠাৎ উন্মোচিত হইলে সেই সেই বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ জাতীয় জ্ঞান আমাদের উৎপন্ন হয়। কোন জ্ঞান বা চাক্ষুষ-জাতীয় এবং রূপ-বোধের জনক, কোনো কোনো জ্ঞান বা স্পর্শ-জাতীয় ইত্যাদি। এই সমস্ত বিভিন্ন জাতীয় জ্ঞান আত্মার মধ্যে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। কর্মফলানুসারে ও বহির্জগতের আলোক প্রভৃতির ও তন্মধ্যবর্তী বস্তু এবং আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের উন্মুক্ত অবস্থায় এই সমস্ত কারণে আমাদের আত্মার মধ্যে এমন একটী বিশেষ অবস্থা ঘটে যাহাতে কোনো একটী বিশেষ জাতীয় জ্ঞান আমাদের উৎপন্ন হয়। এইজন্য ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রথম একটী নির্বিকল্প বস্তুমূলক জ্ঞান হয় পরে তাহা স্ফুট হইয়া ওঠে, এই সমস্ত সিদ্ধান্ত মানিবার কোনো প্রয়োজন নাই। প্রত্যক্ষের সহিত অন্যরূপ জ্ঞানের পার্থক্য দেখাইতে গিয়া জৈনেরা বলিয়াছেন যে জ্ঞান দুই প্রকার, অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষের সহিত পরোক্ষ জ্ঞানের এইখানেই পার্থক্য যে অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ অত্যন্ত পরিস্ফুট ও স্পষ্ট কিন্তু স্মৃতি বা অনুমান হইতে যে জ্ঞান হয় তাহা প্রত্যক্ষের ন্যায় স্ফুট ও স্পষ্ট নয়। জৈনেরা বেদের প্রামাণ্য মানেন না কিন্তু জৈন তীর্থঙ্করদের বাক্য

বিশ্বস্ত বা আপ্তব্যক্তির বাক্য বলিয়া সেগুলির প্রামাণ্য স্বীকার করেন।

জৈনেরা বলেন যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্গেই আমরা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুকে পাইয়া থাকি। জ্ঞানের দ্বারাই বহির্বস্তু প্রকাশিত হয়, অতএব বহির্বস্তু দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় ইহা মানিবার কোনো কারণ নাই। সকল জ্ঞানই আত্মা ও ধর্ম্মরূপে প্রকাশ পায় কারণ প্রত্যেক জ্ঞানেই আমরা মনে করি যে আমরা জানিতেছি। অতএব ইহাই স্বীকার করিতে হয় যে, কোনো না কোনো কারণে আত্মার বিশেষ বিশেষ প্রকাশক ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। যে সমস্ত কারণে জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়া লোকে মনে করে, সেই কারণগুলির এইখানেই সার্থকতা যে তাহাতে আত্মার মধ্যে এমন একটী বিশেষ যোগ্যতা বা সামর্থ্য উৎপন্ন করে যাহাতে আপন আবরণ উন্মোচিত হইয়া বিশেষ বিশেষ প্রকাশধর্ম্ম অভিব্যক্ত হয়। এই প্রকাশধর্ম্ম বা জ্ঞানের দ্বারা আমরা বহির্বস্তুর সত্যতা উপলব্ধি করি। এই জ্ঞানের দ্বারা আমরা ইহাও উপলব্ধি করি যে বহির্বস্তু কোনো অংশে স্থিররূপেই থাকে এবং কোনো অংশে তাহার ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হয় এবং কোনো অংশে নূতন ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। সোণা, সোণারূপে সোণাই থাকে;

সোণার একটী পিণ্ড লইয়া যখন আমরা একটী কুণ্ডল প্রস্তুত করি তখন তার পিণ্ডাকার-ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়, এবং কুণ্ডলাকার-ধর্ম্ম নূতনভাবে উৎপন্ন হয়। আমাদের উপলব্ধিকে যদি আমাদের মানিতে হয় তবে আমরা বৌদ্ধদের ন্যায় বস্তুকে ক্ষণিক বলিতে পারি না। পরিবর্ত্তনশীলতা যেমন বস্তুর ধর্ম্ম তাহার স্থিরতাও তেমনি একটী ধর্ম্ম।

জৈনেরা জীবশক্তি বা আত্মা মানিয়া থাকেন। এই আত্মার আত্মস্বভাবে অনন্তদর্শন, অনন্তজ্ঞান ও অনন্তবীর্য্য আছে। কিন্তু কর্ম্মরূপ সূক্ষ্ম জড়পদার্থ দ্বারা এই আত্মা আবৃত রহিয়াছে, কাজেই ইহার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন ও অনন্তবীর্য্য ইহা অনুভব করিতে পারে না। ঘটনা সংঘাতের বৈচিত্রে সময় সময় কোনো কোনো বিশেষ জ্ঞান বা দর্শন কর্ম্মাবরণ হইতে মুক্ত হইয়া প্রকাশ পায়। এই আত্মা যখন সর্ব্ব কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তি পায় তখন ইহা আপন অনন্ত-দর্শন, অনন্ত-জ্ঞান ও অনন্ত-বীর্য্য অনুভব করে। এতাদৃশ আত্মা ও ঈশ্বরে কোনো পার্থক্য নাই। এই আত্মা দেহের সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে সেইজন্য দেহের যে কোনো স্থানে কোনো বিকার উপস্থিত হয় তখনই ইহা তাহা জানিতে পারে। নানা স্তরের আত্মা আছে। যাহার নিকট যে-জাতীয় ইন্দ্রিয়-জ্ঞান সম্ভব সে

সেই জাতীয় আত্মা। সর্ব্ব নিকৃষ্ট স্তরের আত্মার কেবল মাত্র এক জাতীয় ইন্দ্রিয়জ্ঞান হইতে পারে। ক্রমশ: উচ্চস্তরের আত্মায় আমরা দুই ইন্দ্রিয়, তিন ইন্দ্রিয়, চার ইন্দ্রিয় বা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান দেখিতে পাই। একজাতীয় আত্মা হইতে জন্মান্তরে অন্য জাতীয় আত্মা আপনাকে অভিব্যক্ত করে। সমস্ত পৃথিবী জল, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আত্মায় পরিপূর্ণ। একটী নস্যির কৌটার মধ্যে তাহা পূর্ণ করিয়া যেমন নস্যির গুঁড়া থাকে তেমনি সমস্ত পৃথিবী ও আকাশ পূর্ণ করিয়া অসংখ্য আত্মা রহিয়াছে। এই সমস্ত আত্মাকে নিগোদ কহে। কোনো আত্মা মুক্ত হইলে কোনো একটী নিম্নস্তরের আত্মা আসিয়া সেই স্থান পূর্ণ করে। কাজেই সর্ব্বজীবের যে একসময়ে মুক্তি হইবে এরূপ আশা করা যায় না। এই আত্মাকে জৈনরা জীব বলে। ইহাই জীবশক্তি বা প্রাণশক্তি। ইহা দেহ হইতে বিভিন্ন এবং আমাদের প্রত্যেক জ্ঞানে ইহার সত্বা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। প্রত্যেক অজীব পদার্থ যথা মাটি, জল প্রভৃতি আত্মায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অজীব পদার্থকে এই জীব পদার্থ ব্যপ্ত করিয়া রহিয়াছে। এই ব্যাপ্তি-ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া জীবকে জীবাস্তিকায় বলা হয়।

অন্যান্য দার্শনিকদের ন্যায় জৈনেরাও বলেন যে কর্ম্মের

ফলেই আমাদের নানারূপ জন্ম ঘটে এবং ইহজন্মেও আমরা নানারূপ সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। যোগসূত্রে লিখিত আছে যে কিরূপ জন্ম হইবে, কতদিন আমাদের জীবিতকাল হইবে এবং কিরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিব তাহা কর্ম্মের দ্বারাই নির্ণীত হয়। কিন্তু জৈনেরা কর্ম্ম সম্বন্ধে আর একটু স্থূলরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে কর্ম্মের দ্বারা একরূপ সূক্ষ্ম আবরণ প্রস্তুত হয়, এবং সেই আবরণের দ্বারা আমাদের আত্মা আবৃত হয়। এবং এই আবরণের ফলেই আত্মার নানারূপ রং হয়। এই রংগুলিকেই লেশ্যা বলে। এই কর্ম্মাবরণের বিভিন্ন কার্য্য অনুসারে ইহার নানারূপ নাম দেওয়া হইয়া থাকে, যেমন, জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মহাবরণীয় ইত্যাদি। কর্ম্মের এই স্থূল আবরণকে দ্রব্যকর্ম্ম বলে। মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন পূর্ব্ব কর্ম্মের ক্ষয় হইতেছে তেমনি আবার নূতন কর্ম্ম জন্মিতেছে। যে পর্য্যন্ত না সর্ব্ব কর্ম্ম ক্ষয় হয় সে পর্য্যন্ত কর্ম্ম এইরূপ জন্মে এবং ক্ষয় হয়। এইরূপ কর্ম্ম ক্ষয়কেই নির্জ্জর বলে। সূক্ষ্ম কর্ম্মপদার্থ যে আত্মার মধ্যে প্রবেশ করে তাহাকে আশ্রব বলে। বাক্য, মন ও দেহ দ্বারা আমরা কর্ম্ম সঞ্চয় করি। ইহাদিগকেই কর্ম্ম সঞ্চয়ের প্রণালী বা পথ বলে। এইরূপ কর্ম্ম কয়াকে

ভাবাস্রব বলে এবং যখন সেই কর্ম্ম আত্মাকে মলিন করে এবং আত্মার উপর আবরণ, হইয়া থাকে তখন তাহাকে দ্রব্যাস্রব বলে।

জৈনেরা জীব, অজীব, আস্রব, সম্বর, নির্জ্জর, বন্ধ ও মোক্ষ এই সাতটী পদার্থকে মানিয়া থাকেন। জীবের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অজীব-কে সাত ভাগে বিভক্ত করা হয়। পুদ্গলাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, কাল, পুণ্য, পাপ। পুদ্গল বলিতে জড় পদার্থ বা ভৌতিক পদার্থ (matter) বোঝায়। অস্তিকায় বলিতে ব্যাপ্তি বুঝায়। পুদ্গল অর্থে আকারহীন পরমাণু বোঝায়। ইহারা নিত্য। ইহারা স্থূল এবং সূক্ষ্মরূপে থাকে। সাধারণ ভৌতিক পরমাণু স্থূল আর কর্ম্মের পরমাণু সূক্ষ্ম। সকল ভৌতিক পদার্থ পরমাণুপুঞ্জে নির্ম্মিত। পরমাণুগুলি সাজাইবার পদ্ধতিতে (অর্থাৎ তাহাদের Geometrical form অনুসারে) একজাতীয় পরমাণু হইতে বিভিন্ন বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম বলিতে জৈনরা যাহা বুঝেন তাহা অন্য দর্শন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ঐন্দ্রিয়ক গুণ-বর্জ্জিত একটী ব্যাপক পদার্থকে ধর্ম্ম বলে। এই ধর্ম্ম দিতেছে সেই পদার্থ যাহা থাকিবার জন্য বস্তুতে গতি সম্ভব হয়।

ধর্ম্ম পদার্থ না থাকিলে কোনো বস্তুই নড়িতে চড়িতে পারিত না। যেমন জল আছে বলিয়াই মাছেরা সন্তরণ করিতে পারে, সেইরূপ ধর্ম্ম সমস্ত স্থান ব্যপ্ত করিয়া আছে বলিয়া আমাদের গমনাগমন সম্ভব হয়। ইহা প্রেরক নহে, কিন্তু গতির সহায়ক মাত্র। এই ভূমণ্ডলের বাহিরে মুক্ত-লোকের কোনো ধর্ম্ম নাই। আত্মারা মুক্তি পাইয়া সেখানে গেলে তাহারা নড়িতে চড়িতে পারে না। স্থির হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত পদার্থকে অধর্ম্ম কহে। অধর্ম্ম সেই পদার্থ যাহা আছে বলিয়া আত্মা বা জড়পদার্থ একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে। সেই ব্যাপক পদার্থকেই আকাশ বলে যাহা এই পৃথিবী এবং সমস্ত মুক্ত লোককে ব্যপ্ত করিয়া রহিয়াছে, যাহার মধ্যে আর সমস্ত পদার্থ রহিয়াছে এবং বিচরণ করিতেছে, ইহা শূন্যতা বা নিরাবরণতা মাত্র নহে। ইহা একটী পদার্থ।

কালকে জৈনরা একটী দ্রব্য বলিয়া মনে করেন, ইহা পরমাণুর ন্যায় অসংখ্য। ইহারা পরস্পর মিলিত হয় না। কোনো বস্তু যখন একটী গুণ পরিত্যাগ করিয়া আর একটী গুণ গ্রহণ করে কিম্বা যখন কোনো পরমাণুর গুণের পরি-বর্ত্তন হয় তখন এই কালই সেই পরিবর্ত্তনের সহায়তা করে। ক্ষণ, দণ্ড বা প্রহরাদিরূপে যখন কালকে দেখা

যায় তখন তাহাকে বলে সময়। একটী পরমাণুর স্বকীয় আয়তন পরিমিত স্থান ভ্রমণ করিতে যে সময় লাগে তাহাই সময়ের ন্যূনতম পরিমাণ। জৈনেরা বলেন যে এই পৃথিবী-লোকের উপরে আর একটী লোক আছে। পৃথিবী-লোককে বলা যায় লোকাকাশ। এই লোকাকাশে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম থাকাতে সকল বস্তুর এখানে গতি ও স্থিতির সম্ভব হয়। কিন্তু ইহার ঊর্দ্ধতম আকাশে কোনো ধর্ম্মা-ধর্ম্ম না থাকাতে মুক্ত জীবেরা সেখানে নিশ্চল হইয়া অবস্থান করেন।)

জৈনদের মতে যোগের দ্বারা মোক্ষ লাভ করা যায়। যথার্থ জ্ঞান, পূর্ব্বতন জিনদের বাক্যে শ্রদ্ধা এবং চারিত্র (সমস্ত মন্দ কর্ম্ম হইতে বিরতি) এই তিনটীকে লইয়া জৈনদের যোগ। চারিত্র অর্থে অহিংসা, সত্যবাক্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ বুঝায়। অস্তেয় অর্থে চুরি না করা এবং অপরিগ্রহ অর্থে সর্ব্ব প্রকার লোভ ও আসক্তি হইতে বিরত থাকা। এই সমস্ত ধর্ম্মগুলি সন্ন্যাসীর পক্ষেই কঠোরভাবে দেখা হইত। গৃহীর পক্ষে সাধারণ ভাবে সাধু জীবন যাপন করিলেই চলিত। কিন্তু অহিংসাই ছিল মূল মহা-ব্রত। সত্যবাক্য, অস্তেয় এবং ব্রহ্মচর্য্য অহিংসারই নামান্তর। গৃহস্থেরা এই গুণগুলিকে মোটামুটি ভাবে

পালন করিত। এই রকম মোটামুটি পালন করাকে অনু-
ব্রত বলিত। কিন্তু এইগুলিকেই অতি কঠোর ভাবে
পালন করার নামই মহাব্রত। পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রেও
সন্ন্যাসী বা যোগীর পক্ষে অহিংসাকে মহাব্রতরূপে পালন
করার নির্দ্দেশ আছে। এই জন্য যোগী নিঃশ্বাস প্রশ্বাস
পর্য্যন্ত নিরুদ্ধ করিতেন। কারণ নিশ্বাস প্রশ্বাসে বহু
প্রাণী বিনষ্ট হয়। কিন্তু অনুব্রত হিসাবে গৃহীরা যখন
অহিংসা আচরণ করিতেন তখন বৈধ হিংসা ছাড়া অন্যরূপ
হিংসা করা নিষেধ ছিল। বৈধ হিংসা বলিতে সেইরূপ
হিংসা বোঝায় যে রূপ হিংসা যে জাতির মধ্যে শাস্ত্রানু-
মোদিত, যেমন ব্রাহ্মণের পক্ষে যজ্ঞে পশুবধ, কিন্তু
দের মতে কোনরূপ হিংসাই বৈধ নহে। ইহা ছাড়া
অনেক প্রকারের চরিত্রের বিশুদ্ধতা সম্পাদনের কথা জৈন-
যোগে বিহিত আছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা বিস্তারিত
বলিবার প্রয়োজন নাই। আত্মজ্ঞানের দ্বারাই যথার্থ জ্ঞান
লাভ করা যায়। আত্মার চিন্ময় এবং কর্ম্মানুসারের
শরীরের সহিত ইহার যোগ হয়। যখন চারিত্র এবং
ধ্যানের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম বিনষ্ট হয় তখন আত্মা বিশুদ্ধ হয়
জৈনশাস্ত্রে রাগদ্বেষকে কষায় বলে। আত্মা যতক্ষণ
যুক্ত থাকে ততক্ষণ তাহা সংসারের আবর্ত্তে ঘুরিতে থাকে

ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ এই চারিটাই প্রধান কষায়। ইন্দ্রিয় দমন না করিতে পারিলে কষায় দূর করা যায় না ও মনঃশুদ্ধিও ঘটে না। মনঃশুদ্ধি না ঘটিলে যোগমার্গে অগ্রসর হওয়া যায় না। রাগদ্বেষ না দূর হইলে কোনো তপশ্চর্য্যা করা যায় না, রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা আমাদের স্বাধীনতা হারাই। যখন সর্ব্বভূতে মানুষের সমত্ব জ্ঞান আসে তখনই সে রাগদ্বেষ জয় করিতে পারে। এই সমত্ব মনের মধ্যে আনিতে হইলে সর্ব্ববস্তুই যে অনিত্য এই কথা নিরন্তর মনে অনুধ্যান করিতে হয়। ভাবিতে হয় যে সংসার দুঃখময়। ভাবিতে হয় যে কর্ম্মের দ্বারাই আমাদের নানারূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয় এবং সংসারচক্রে ঘুরিতে হয়, মৈত্রী ও করুণার দৃষ্টিতে যখন আমরা সকলকে দেখিতে শিখি এবং যখন সমস্ত কষায় দূর হয় তখনই আমাদের মঙ্গল ঘটিতে পারে। 'এইরূপে চরিত্রের বিশুদ্ধতায় ও মৈত্রী, করুণা প্রভৃতি ভাবনার দ্বারা যখন আমরা আমাদের চিত্তকে পবিত্র করিতে পারি তখনই কর্ম্মের আস্রব অর্থাৎ প্রবাহ বন্ধ হয়। পূর্ব্বে যে গুণ-গুলির কথা বলা হইয়াছে তাহা ছাড়া সংযম, শৌচ, অকিঞ্চনত্ব, তপস্যা, ক্ষান্তি (সকল বিষয় সহ্য করিবার ক্ষমতা), মার্দব (মৃদুত্ব), ঋজুতা (সারল্য) এবং সমস্ত

পাপ হইতে বিমুক্তি না ঘটিলে আমাদের মুক্তি ঘটিতে পারে না। এইরূপ ভাবে যখন আমরা চিত্তকে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ করিতে পারি এবং ধ্যানে নিমগ্ন হই তখনই ক্রমশঃ আমাদের সমস্ত কর্ম্মাবরণ বিনষ্ট হইয়া যায়।

আত্যন্তিক ভাবে দুঃখ দূর করা এবং চিরকালের জন্য সুখ অনুভব করা এই জন্যই লোকে মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়। মুক্তি অবস্থায় অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত দর্শন লাভ করিয়া আত্মা চিরকালের জন্য সুখ অনুভব করে। মুক্তি অবস্থায় সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে এককালীন সমগ্র জ্ঞান লাভ করা যায়, সংসার দশায় কর্ম্মের আবরণ একটু একটু দূর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু জ্ঞান হয় আবার সেই জ্ঞান আবৃত হয়, আবার নূতন নূতন জ্ঞান হয়। মুক্তি অবস্থায় সমস্ত কর্ম্মের আবরণে দূর হওয়াতে সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া আত্মা নিশ্চল ভাবে থাকে। সংসার দশায় যদিও আমরা কর্ম্মের দ্বারা আবৃত থাকি তথাপি আমাদের স্বাধীন বীর্য্য কখনও লুপ্ত হয় না। এই বীর্য্যকে আশ্রয় করিয়া জৈনশাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সাধুপন্থা অবলম্বন করিলে আমরা কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি।

বৌদ্ধ দর্শন—আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৫৬০ শতকে নেপালের দক্ষিণে কপিলবস্তুর অন্তর্গত লুম্বিনী গ্রামে

শাক্যবংশে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল শুদ্ধোদন ও মাতার নাম ছিল মহামায়া। তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে গোপার সহিত বিবাহ দেন এবং তাঁহাকে নানাভাবে বিষয়াসক্ত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এক সময় বৃদ্ধ, রোগাতুর, মৃত ও একজন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তখন তাঁহার বয়স ২৯। তিনি প্রথমে রাজগৃহে, তৎপরে উরুবেলায় গমন করেন ও পাঁচজন তপস্বীর সহিত যুক্ত হইয়া তপস্যায় নিরত হন। ছয় বৎসর তপস্যার পর তিনি অনুভব করেন যে কেবল কঠোর তপস্যার দ্বারা সত্যলাভ করা যায় না। তৎপরে অনেকটা সাধারণভাবে জীবন-যাপন করিয়া নিরন্তর ধ্যানরত হইয়া পরম জ্ঞানলাভ করেন। তিনি বুঝিলেন যে যে জ্ঞান তিনি লাভ করিয়াছেন তাহা দ্বারাই সকলের সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্ত হইবে। তারপর ৪৫ বৎসরের অধিককাল নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া আশি বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। কথিত আছে যে দেহরক্ষার সময় তিনি ধ্যাননিরত হইয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থার মধ্য দিয়া পরিশেষে নির্ব্বাণ লাভ করেন। ইহাকেই মহা-পরিনির্ব্বাণ বলে। বুদ্ধের বচন অবলম্বন করিয়া এসিয়ার নানা দেশে বিশেষতঃ

লঙ্কায়, ব্রহ্মে, চীনে এবং তিব্বতে যে বিরাট বৌদ্ধসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার অনেকখানিই এখন আমাদের নাগালের বাহিরে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধসাহিত্য একরূপ সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানকালে নানা দেশ হইতে পালিতে ও সংস্কৃতে অনেক বৌদ্ধসাহিত্যে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এখনও অনেক গ্রন্থ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইতে বাকি আছে। বুদ্ধ নিজে কোনো গ্রন্থ লিখিয়া যান নাই, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী কালে তাঁহার উপদেশাবলী তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যেরা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এই উপদেশাবলী তিন ভাগে বিভক্ত এবং ইহারা পলি ভাষায় লিখিত। ইহাদিগকে সুত্ত পিটক, বিনয় পিটক ও অভিধম্ম পিটক বলা হইয়াছে। (১) দীঘ নিকায়, (২) মাজ্‌ঝিম নিকায়, (৩) সংযুক্ত নিকায়, (৪) অঙ্গুত্তর নিকায়, (৫) খুদ্দক নিকায় (ধর্ম্ম পদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, পেত-বত্থু, থেরী গাথা, জাতক, নিদ্দেশ, পটিসম্ভিদা মগ্‌গ অপদান, বুদ্ধবংশ, চর্য্যাপিটক)। এই পাঁচখানি গ্রন্থ লইয়া সুত্ত-পিটক। পঠ্যান, ধম্মসঙ্গণি, ধাতুকথা, পুগ্‌গল পঞঞত্তি, বিভঙ্গ, যমক এবং কথাবত্থু লইয়া অভিধম্মপিটক। বিনয়পিটকে প্রধানতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিয়ম ও অনুশাসন

প্রভৃতি উপদিষ্ট হইয়াছে। পালিভাষায় লিখিত এই সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও দর্শনের যে অংশটী যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকে স্থবিরবাদ বা থেরবাদ বলে। এই সমস্ত পালি গ্রন্থের বহু টীকা টিপ্পনী হইয়াছে এবং এই থেরবাদ অবলম্বন করিয়া অনেক প্রকরণ গ্রন্থও লেখা হইয়াছে। কিন্তু মনে হয় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের বিসুদ্ধি মগ্‌গের লেখক বুদ্ধঘোষের পর থেরবাদ মতে আর বেশী গ্রন্থ ভারতবর্ষে লিখিত হয় নাই। এই থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম্ম নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। বুদ্ধ বচনের যথার্থ অর্থ কি, ইহা লইয়া বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে বহু মতভেদ উপস্থিত হয় এবং খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতকে, অশোকের সময়ে সংশয় মীমাংসার জন্য তৃতীয়বার বৌদ্ধ পণ্ডিতদের পরিষদ ডাকা হয়, পরে খৃষ্টীয় প্রথম শতকে মহারাজ কণিষ্কের সময়ে আর একটী পরিষদ ডাকা হয়।

বোধ হয় খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকেই বৌদ্ধ ভিক্ষুকের মধ্যে অনেক মতভেদ হয়, মহাসঙ্ঘিক নামে এক বৌদ্ধ সম্প্রদায় থেরবাদী সম্প্রদায় হইতে পৃথক হইয়া যায়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই পরবর্ত্তী কালে মহাযান সম্প্রদায় নামে খ্যাত হয়। খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতকের পূর্ব্ব হইতেই মহাযান সূত্র নামে কতকগুলি গ্রন্থ লিখিত হইতে আরম্ভ হয়

এবং আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতক পর্য্যন্ত সমস্ত সূত্র, লিখিত হইতেছিল। ইহাদিগকে বৈপুল্য সূত্র বলে। ইহার অনেকগুলি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় তৃতীয় শতকে চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। সমস্ত মহাযান সাহিত্যই সংস্কৃতে লিখিত। আমরা প্রথমতঃ থেরবাদ বৌদ্ধ দর্শনের কথা বলিব ও পরে মহাযান বৌদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

থেরবাদ বৌদ্ধ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিভিন্ন মতবাদ উঠিয়াছিল, সেগুলি সম্বন্ধে আমার History of Indian Philosophy-র প্রথম খণ্ডে নাতি-বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

গৌতমের মনে প্রথম প্রশ্নই ছিল এই যে দুঃখকে কেমন করিয়া একেবারে ধ্বংস করা যায়। এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল যে কী না হইলে দুঃখ, জরা ব্যাধি, মৃত্যু হয় না। ইহার উত্তরে তাঁহার মনে আসিল যে জন্ম না হইলে দুঃখ, ব্যাধি প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না। কারণ, যে জন্মে তারই ত হয় ব্যাধি দুঃখ। আবার মনে প্রশ্ন উঠিল, কী না হইলে জন্ম হয় না। উত্তরে মনে আসিল, পূর্ব্বজন্ম সঞ্চিত কর্ম্ম অর্থাৎ "ভব" না থাকিলে জন্ম হয় না, কেননা কর্ম্মের ফলেই

মানুষের জন্ম। কী না করিলে মানুষ কর্ম্ম করে না। উত্তরে মনে হইল, যদি কোনো বিষয়ে দুরন্তভাবে চাওয়া না জাগে তবে লোকে কর্ম্ম করে না। এই দুরন্তভাবে চাওয়ার নাম "উপাদান"। তৃষ্ণা না থাকিলে এই কর্ম্ম-প্রবৃত্তি বা দুরন্ত চাওয়ার ইচ্ছা হয় না। সুখ দুঃখ অনুভব বা বেদনা না থাকিলে তৃষ্ণা হয় না। ইন্দ্রিয় সংস্পর্শ ব্যতীত সুখদুঃখ বোধ হয় না এবং ইন্দ্রিয় বা আয়তন না থাকিলে ইন্দ্রিয় স্পর্শ ঘটিতে পারে না। দেহ এবং মন না থাকিলে ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে না; দেহ এবং মনকে একত্রে নাম-রূপ বলে। বিজ্ঞান না থাকিলে আবার নামরূপ হইতে পারে না। কারণ ইন্দ্রিয়ের মূলই জ্ঞান। ইন্দ্রিয়শক্তি জ্ঞানেরই অন্তবর্ত্তী এই জ্ঞান বা বিজ্ঞান দেহ না হইলে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইজন্যই ইহার সহিত দেহ অনুস্যূত থাকে। আবার বিজ্ঞান বা জ্ঞান বলিয়া একটা পদার্থ নাই অনেকগুলি প্রক্রিয়া পরস্পর সম্মিলিত হইয়া বিজ্ঞানকে উৎপন্ন করে। এই পরস্পর মিলনধর্ম্মী প্রক্রিয়াগুলিকে সংখার বলে। সংখার না থাকিলে বিজ্ঞান হয় না। আবার অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞান না থাকিলে সংখারগুলি উৎপন্ন হইতে পারে না। এই বারটী পরস্পর কারণ-কার্য্যরূপে মিলিত হইয়া যেন চক্রের

শ্যায় ঘুরিতেছে এবং ইহাতেই জন্ম মৃত্যুর সংসার যাত্রা চলিতেছে। এইজন্য ইহাকে ভবচক্র বলে।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে বৌদ্ধমতে কার্যাকারণ সম্বন্ধ অন্যমত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই মতে উপাদান কারণ, নিমিত্ত কারণ বা সহকারী কারণ প্রভৃতি কারণের বিভাগ মানা হয় না, যাহা থাকিলে বা যাহা ঘটিলে, যাহা থাকে বা যাহা ঘটে তাহাকেই তাহার কারণ বলা যায়। ইহা ঘটিলে উহা ঘটিবে, এইটুকুই মাত্র কারণ-কার্য্যের সম্পর্ক। ইহাকে বলে প্রতীত্য সমুৎপাদন (ইহা ঘটিয়া উহা ঘটিল বা উৎপন্ন হইল)। যে ভবচক্রটীর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহা তিনটী জন্ম লইয়া ঘটিত; প্রথম একটীতে জন্ম, জরা, মরণ; দ্বিতীয়টীতে তাহার পূর্ব্বজন্মের নামরূপ বা ইন্দ্রিয় ও তৎস্পর্শ জনিত সুখদুঃখ ভোগ এবং তজ্জনিত প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম সঞ্চয় পর্য্যন্ত; তৃতীয়টীতে পাই বিজ্ঞান, সংখার এবং অবিদ্যা। পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় জন্মের যে বিজ্ঞান তাহা দ্বিতীয় জন্মের দেহের উৎপত্তির কারণ হয়। বৌদ্ধেরা বলেন যে মৃত্যুকালে মনে যেরূপ চিন্তা ওঠে পরজন্মে সেইরূপই তাহার জন্ম হয়, বিজ্ঞানই মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া দেহকে উৎপন্ন করে। এই বিজ্ঞান উৎপন্নই হইতে পারিত না,

যদি কর্ম্ম সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া চিন্তার অন্তবর্ত্তী নানা ধারা আপনাকে বিজ্ঞানরূপে প্রকাশ না করিত। আবার নিরন্তর ক্ষণস্থায়ী বস্তুকে স্থির বলিয়া একটা মিথ্যা বুদ্ধি যদি না থাকিত, তবে বিভিন্ন কর্ম্ম সংস্কার ও জ্ঞানের অন্তবর্ত্তী নানা ব্যাপার একটী স্থায়ী বিজ্ঞানকে প্রকাশ করিতে পারিত না। অবিছাকে অবলম্বন করিয়া সংখারের উৎপত্তি এবং সংখারকে অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞানের উৎপত্তি, ইহাই প্রতীত্যসমুৎপাদরূপ কারণ-কার্য্যের প্রক্রিয়া। প্রতীত অর্থে "ইহা পাইয়া", সমুৎপাদ অর্থে উহার প্রাতুর্ভাব। ইংরাজীতে বলিতে গেলে "প্রতীত্য" "পটিচ্চ" বা "পচায়" ইহাদের ground বা "স্থিতি কারণ" বলা যায়। সংখারগুলি যে উৎপন্ন হয়, পরস্পর একত্র সম্মিলিত হয় তাহার কারণ অবিছা। অবিছা না থাকিলে তাহা ঘটিতে পারে না।

নৈয়ায়িকেরা সত্বাকে একটী জাতি বলিয়া মনে করেন। কোনো বস্তু যখন সত্বার সহিত সমবায় সম্বন্ধে যুক্ত হয় তখন তাহাকে সৎ বা আছে বলা যায়। অদ্বৈত-বেদান্তীরা সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এই তিনকেই এক সৎস্বরূপ বলিয়াই মনে করেন। ইহাই অপরিবর্ত্তনীয় পরমার্থসত্য। যাহা কিছু কার্য্য তাহাই মিথ্যা এবং এই সৎস্বরূপের উপর

কেবল প্রতীত হয় মাত্র। সংস্বরূপ ব্যতিরেকে তাহাদের কোনো যথার্থ সত্ত্বা নাই। জৈনেরা বলেন, সকল বস্তুই কোনো অংশে ধ্রুবসৎ, কোনো অংশে পরিবর্ত্তনীয় এবং কোনো অংশে নিরন্তর উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু বৌদ্ধেরা বলেন যে যাহা কিছু কোনো প্রয়োজন সিদ্ধি করে কিম্বা কোনো কার্য্য করিতে সক্ষম তাহাই সং বা আছে। ইহাকেই বলে অর্থ-ক্রিয়া-কারিত্ব নিয়ম অর্থাৎ অর্থকারিত্ব বা প্রয়োজন সাধকত্ব এবং ক্রিয়া-কারিত্ব অর্থাৎ কোনো কার্য্য নিষ্পাদকত্বই হইতেছে বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ, কাজেই প্রত্যেক প্রয়োজন সাধকত্ব এবং প্রত্যেক ক্রিয়া কারিত্বের উপর তদনুসারে পৃথক পৃথক অস্তিত্ব মানিতে হয়। এক ক্ষণে যে ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, সেই ক্ষণের ক্রিয়া অনুসারে একটী বস্তু মানিতে হয়, কিন্তু এক ক্ষণে যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় দ্বিতীয় ক্ষণে সেই ক্রিয়াটীই আবার নিষ্পন্ন হইতে পারে না; সেইজন্য প্রথম ক্ষণের ক্রিয়া অনুসারে যে বস্তু আছে বলিয়া মানা গেল দ্বিতীয় ক্ষণে সেই বস্তুটীই যে আছে তাহা বলা যায় না। দ্বিতীয় ক্ষণে আর একটী ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। সেই ক্রিয়া অনুসারে দ্বিতীয় ক্ষণে আর একটী বস্তুর অস্তিত্ব মানিতে হয়। একটী বস্তুই যদি দুই ক্ষণ থাকিত তবে সেই দুই ক্ষণেই একই কার্য্য করিত।

যেহেতু দুই ক্ষণে দুইটী কার্য্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন সেইজন্য ইহা বলা যায় না যে একটী বস্তুই দুই ক্ষণে আছে। কারণ একই কার্য্য দুই ক্ষণে সম্পন্ন করা যায় না। ইহাকে বলে বৌদ্ধ ক্ষণভঙ্গবাদ। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে ইহা পরিষ্কার করিয়া বলা হয় নাই বটে কিন্তু ইহাই যে ভিতরের তাৎপর্য্য তাহা অস্বীকার করা যায় না।

অদ্বৈত-বেদান্তীরা সাংখ্য, যোগ এবং মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনে স্থায়ী আত্মা মানেন, কিন্তু বৌদ্ধেরা কোনো স্থায়ী আত্মা মানেন না। এই জন্য তাহাদের দর্শনকে নৈরাত্মদর্শন বলে। সংযুক্ত-নিকায় লিখিত আছে যে যেমন পদ্ম বলিতে কতকগুলি পদ্মের দল, তাহার কেশর, তাহার ডাঁটা প্রভৃতির একত্র সন্নিবেশ ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না তেমনি আত্মা বলিতেও কোনো স্থায়ী বস্তু বোঝায় না। কতকগুলি চিত্তবৃত্তি একত্র সম্মিলিত হইলে, সেইগুলিই একত্রিত হইয়া যেন তাহারা একটী বস্তু এবং সেই বস্তুটীই যেন আত্মা বা আমি এইরূপ ভ্রম জন্মায়। মিলিন্দপঞ্হে ভদন্ত নাগসেন মহারাজ মিলিন্দকে ইহাই বুঝাইয়াছিলেন যে রথ বলিয়া কোনো একটী বস্তু নাই। চাকা, বসিবার স্থান, ঘোড়ার জোয়াল, মাথার আচ্ছাদন প্রভৃতির একত্র সমষ্টিকে রথ বলে। রথ বলিয়া কোনো

একটী অখণ্ড পদার্থ নাই। এই মতটী, অর্থ-ক্রিয়া-কারিত্বই যে অস্তিত্বের প্রমাণ এই মত হইতে স্পষ্ট পাওয়া যায়। চাকা প্রভৃতি রথের প্রত্যেকটী অংশের স্বতন্ত্র ক্রিয়া কারিত্ব আছে, সেই হিসাবে তাহাদের প্রত্যেকরই বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষণিক অস্তিত্ব আছে। এই ক্ষণিক অস্তিত্বগুলি মিলাইয়া যখন আমরা একটী অস্তিত্ব বলিয়া মনে করি তখনই আমাদের মনে হয় যে রথ যেন একটী স্বতন্ত্র অখণ্ড বস্তু। ইহা হইতেই বৌদ্ধদের খন্ধ বা স্কন্ধ-মতবাদের উৎপত্তি।

খণ্ড বা স্কন্ধ শব্দ কতকগুলি বস্তুর একত্র সম্মিলন বা সংহতি বোঝায়, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া পাঁচটী স্কন্ধের বিভাগ করা হইয়াছে। চতুর্ভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ), শরীর, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় প্রভৃতি একত্রে রূপস্কন্ধ নাম দেওয়া হইয়াছে ; সুখ,দুঃখ এবং অসুখ-দুঃখ এই অনুভব তিনটীকে একত্রে বেদনা নাম দেওয়া হইয়াছে। জাতিরূপে অর্থাৎ Class রূপে বস্তুকে বুঝিবার প্রণালীকে সঞা বা সংজ্ঞা বলা হয়। মানসিক বৃত্তিগুলি যে পরস্পর বিশেষ বিশেষ ভাবে চলনধর্ম্মা হইয়া বিশেষ বিশেষ ভাবে মিলিত বা পৃথক হয় এই বিশেষ বিশেষ সংহতি ধর্ম্মকে সংখার বলে,

ইহাকে বলে সংখারস্কন্ধ। বিজ্ঞান বলিতে বোধের উন্মেষকে বুঝায়, ইহাকে বলে বিজ্ঞানস্কন্ধ। এই সমস্ত মানসিক বৃত্তিগুলির একটীর উপর নির্ভর করিয়া অপরটী উৎপন্ন হয় এবং মিলিত হয়। যখন কেহ বলে যে আমাকে আমি অনুভব করি তখন সে বাস্তবিক এই পঞ্চ স্কন্ধের সম্মিলনে যে অনুভব তাহারই প্রকাশকে যেন আমি জানিতেছি এইভাবে অনুভব করে। রূপস্কন্ধের রূপ শব্দের একদিকে যেমন পঞ্চভূত বা পঞ্চ ভৌতিক বিকার বোঝায়, অপরদিকে তেমনি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ-রসাদি বোঝায়। প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে বহিঃস্থ রূপ-রসাদি ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যরূপে তাহাদের প্রকাশ ইহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। যে রূপ-রসাদি বাহিরে, তাহাই জ্ঞানকালে আমাদের অন্তরে। ইয়োরোপীয় বর্ত্তমান যুগে Neo-realism-এর সহিত ইহার সাদৃশ্য অতি সুস্পষ্ট। এক অবস্থায় যাহা বহিস্থরূপ রূপে থাকে তাহাই অন্য অবস্থায় রূপ-বোধ রূপে প্রকাশ পায়। এইরূপ প্রকাশ পাইবার কারণ ইন্দ্রিয় সংযোগ। ইন্দ্রিয় সংযোগ হইতে একদিকে যেমন রূপের প্রকাশ অপরদিকে তেমনি সংজ্ঞা ও সংখার খন্দের কার্য্য আরম্ভ হয়। কোন রূপ প্রকাশকে অবলম্বন করিয়া যখন অন্যান্য মনোবৃত্তি চঞ্চল হইয়া উঠিয়া সেই

রূপ প্রকাশকে বিশেষ জ্ঞানরূপে পরিণত করে এবং বিশেষ বিশেষ নাম দিয়া তাহাকে বুঝে, তখনই সংজ্ঞা খন্ধের কাজ চলিতেছে বুঝিতে হইবে। সকলগুলিকে একত্রীকরণের আন্তরব্যাপারকে সংখার কহে। সংখ্যার হইতেছে আমাদের সেই ক্রিয়া-শক্তি যাহাতে কোনো রূপকে অবলম্বন করিয়া অন্তরের বিভিন্ন বৃত্তিগুলি সচল হইয়া ওঠে এবং সেগুলিকে একটী বিশেষ জ্ঞানরূপে পরিণত করিতে সাহায্য করে। তাহাকেই বলে বিজ্ঞান-স্কন্ধ, যাহা অন্তরের ব্যাপারগুলির মধ্য দিয়া ধাবিত হইয়া পরিশেষে একটা জ্ঞানরূপে আপনাকে প্রকাশ করে। অন্য শাস্ত্রে চেতনা বলিতে জ্ঞান বোঝায় কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে চেতনা বলিতে কর্ম্মশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়া (volition) বোঝায়। ইন্দ্রিয় স্পর্শ হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চ স্কন্ধের ব্যাপার বিজ্ঞানে আসিয়া শেষ হয়। বৌদ্ধ-বিজ্ঞান শব্দ বুঝিতে এইজন্যই আমাদের কঠিন লাগে যে বিজ্ঞানকে আমরা অনেক সময় একটা প্রকাশমাত্র বলিয়া বুঝি, কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে রূপের ন্যায় বিজ্ঞানও একটা ধাতু, বস্তু বা পদার্থ। সংখারের অভ্যন্তরে যে ব্যাপার রহিয়াছে তাহাই চেতনা বা volition অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি।

অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও কর্ম্ম ইহাই দুঃখের মূল। গোড়াকার

কারণ অবিদ্যা, কারণ অবিদ্যার ফলেই পরম্পরাক্রমে আসে, তৃষ্ণা ও উপাদান ও তাহা হইতেই উৎপন্ন হয় কর্ম্ম এবং কর্ম্ম হইতেই ঘটে জন্ম এবং জরা মরণাদি দুঃখ। সেইজন্য সাধকের প্রধান কর্ত্তব্য তৃষ্ণা-নিবৃত্তি। এই তৃষ্ণার নিবৃত্তির জন্য এবং অবিদ্যা নিবৃত্তির জন্য তাহাকে দেখিতে হয় যে যেন আসল অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি যাহাতে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে এবং যাহাতে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া অবিদ্যা ধ্বংস পায়। এইজন্য এই তৃষ্ণাজালকে দূর করিবার জন্য আমাদেরকে আশ্রয় করিতে হয়, শীল বা চরিত্র, সমাধি এবং প্রজ্ঞা। বৌদ্ধেরা বলেন যে চারিটী বিষয় সম্বন্ধে আমাদের জাগ্রত হওয়া উচিত :—(১) জগৎ দুঃখময়. (২) এই দুঃখের কারণ কি, (৩) এই দুঃখ দূর করিবার উপায় কি, এবং (৪) এই দুঃখ দুর করিলে কি অবস্থা ঘটে। এই চারিটীকে আর্য্য সত্য কহে। বৌদ্ধদের পূর্ব্ব হইতেই কর্ম্মবাদ প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ যদিও নানা বিষয়ে নূতন নূতন প্রণালীর যুক্তি তর্ক উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তথাপি পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মের ফলেই যে জন্ম হয় এবং মানুষে মানুষে সুখ দুঃখ ভোগের এত তারতম্য ঘটে এ সম্বন্ধে কোনো সংশয় করেন নাই। এই মত উপনিষদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু

রাগদ্বেষ মোহ না থাকিলে কর্ম্মের ফল ঘটিতে পারে না, কারণ উহারা না থাকিলে কর্ম্মের মূল উৎপাটিত হয়। এইজন্যই তৃষ্ণা না থাকিলে কর্ম্ম কোনো ফল উৎপাদন করিতে পারে না। গীতাকারের মনেও বোধ হয় এইরকম বিশ্বাসই ছিল, সেইজন্যই তিনি নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ভোগ্যবিষয়ের প্রতি লালসা হইতেই আসে তৃষ্ণা এবং তৃষ্ণা হইতেই আসে কর্ম্ম এবং কর্ম্ম হইতেই ঘটে দুঃখ। এইটিই প্রথম ও দ্বিতীয় আর্য্য সত্য, অর্থাৎ জগৎ দুঃখময় এবং তৃষ্ণা ও কর্ম্ম হইতেই ঘটে দুঃখ। তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইলে মানুষ যে দশা প্রাপ্ত হয় তাহাকে বলা হয় অর্হৎ। এইটাই আস্তিক্য দর্শনের জীবন-মুক্ত অবস্থা। এইজন্য অর্হৎদের কর্ম্মের কোনো ফল হয় না। গীতাকার বলিয়াছেন "জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন," অর্থাৎ জ্ঞানের অগ্নিতে সমস্ত কর্ম্ম ভস্ম হইয়া যায়। আস্তিক দর্শনে প্রারব্ধ ও অনারব্ধ কর্ম্ম এই দুই বিভাগ আছে। যে সঞ্চিত কর্ম্মগুলির এখনও ফল প্রাপ্তির সময় হয় নাই তাহাকেই বলে অনারব্ধ কর্ম্ম। জ্ঞানের দ্বারা এই অনারব্ধ কর্ম্ম ভস্ম হইয়া যায়। আর যে সমস্ত কর্ম্মের ফলে বর্ত্তমান দেহ তাহার অয়ুষ্কাল ও সেই দেহ-দশায় সুখ দুঃখাদি ভোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার ফল

দেহপাত পর্য্যন্ত ভোগ করিতেই হয়, কিন্তু এই জীবন্মুক্ত দশায় অনুষ্ঠিত কর্ম্মের কোনো সঞ্চয় হয় না এবং তাহার সুফল কুফলও ভোগ করিতে হয় না। তৃষ্ণা নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই অবিদ্যা রাগদ্বেষাদি বিনষ্ট হইয়া যায়। কর্ম্ম তিন প্রকার, কায়িক,বাচিক ও মানসিক, চেতনা বা ইচ্ছাই সকল কর্ম্মের মূল। যখন কোনো ব্যক্তি কাহাকেও হিংসা করিতে ইচ্ছা করে কিন্তু অবসরের অভাবে তাহা করিতে পারে না, তখন তাহার কর্ম্ম কেবল মানসিক; আর যখন কাহাকেও কোনো আদেশ দিয়া কোনো হিংসা করায় তখন তাহার কর্ম্ম মানসিক ও বাচিক; আর যখন নিজে কোনো হিংসা করে তখন তাহার কর্ম্ম মানসিক ও কায়িক। কর্ম্ম চারি প্রকার (১) যে কর্ম্ম হইতে কেবল পাপ উৎপন্ন হয়, (২) যে কর্ম্ম হইতে কেবল বিশুদ্ধতা বা পূণ্য উৎপন্ন হয়, (৩) যে কর্ম্ম হইতে কতক পাপ এবং কতক পূণ্য উৎপন্ন হয়, (৪) যে কর্ম্ম হইতে পাপ বা পূণ্য কিছুই উৎপন্ন হয় না। যোগশাস্ত্রেও এই চারি প্রকার কর্ম্মের নির্দ্দেশ আছে। ইহাদিগকে যথাক্রমে (১) কৃষ্ণকর্ম্ম, (২) শুক্লকর্ম্ম, (৩) শুক্ল-কৃষ্ণকর্ম্ম, (৪) অশুক্লা-কৃষ্ণকর্ম্ম।

শীল বা চরিত্র বিশুদ্ধ আহরণ করিতে হইলে মানসিক,

বাচিক ও কায়িক সংযমের আবশ্যক। এই সংযম প্রথমতঃ চেতনা সংযম বা ইচ্ছা সংযমের দ্বারা হয়; দ্বিতীয়তঃ মনোবৃত্তি বা চেতসিক সংযমের দ্বারা হয়; তৃতীয়তঃ মনঃ সংযম বা সম্বর, চতুর্থতঃ বাক্য ও দেহের সংযমের দ্বারা হয়। সম্বর পাঁচ প্রকার :—পাটিমোক্ষ সম্বর অর্থাৎ সাধারণ ভাবে চিত্ত সংযম; মতি সম্বর অর্থাৎ মনকে সর্ব্বদা সাধুকর্ম্ম ও সাধুচিন্তার দিকে জাগ্রত রাখা, যাহাতে কোনো সময় স্খলন না হয়, খন্তি সম্বর অর্থাৎ শীতাঞ্চাদি পীড়ার মধ্যে সর্ব্বদা অবিকৃত থাকা; ঞান সম্বর অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্ব বিষয়ে সংযত থাকা; বীর্য সম্বর, অর্থাৎ সর্ব্বদা সংযমের দিকে ইচ্ছা শক্তিকে বিনিযুক্ত করা। এই পাঁচটী শীল ও সাধনার দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে সমাধি-মার্গে প্রবেশ করা যায়, এই সমাধিমার্গে প্রবেশ করিবার জন্য সর্ব্ব প্রকার বিষয়-ভোগের প্রতি যাহাতে একান্ত বৈরাগ্য আসে, এই ভাবে মনকে প্রস্তুত করিতে হয়। সংসারে সমস্ত বিষয়ই যে পরিণামে দুঃখকর এই রকম চিন্তাদ্বারা সাংসারিক সমস্ত বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে হইবে। শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণের দ্বারা মনঃ-সংযম যাহাতে সহজে ঘটিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে

হয়। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনার দ্বারা চিত্তকে বিশুদ্ধ করিতে হয়। এইগুলিকে একত্রে বলে ব্রহ্মবিহার। এইরূপে সম্পূর্ণভাবে চিত্ত প্রস্তুত হইলে ধ্যান অবলম্বন করিতে হয়। ক্রমশঃ স্থূল বিষয় হইতে সূক্ষ্ম বিষয়ে ধ্যান করিতে করিতে চরম ধ্যানে উপনীত হওয়া যায়। এই চতুর্থ চরম ধ্যানে সুখ দুঃখ এবং রাগ-দ্বেষের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হয় এবং পরিণামে একান্ত-ভাবে নির্ব্বাণ লাভ করা যায়। নির্ব্বাণে সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি এবং নির্ব্বাণ লাভ হইলে আর জন্ম হয় না। এই নির্ব্বাণে যে ঠিক কী অবস্থা হয় সে সম্বন্ধে বৌদ্ধ লেখকদের মধ্যে এবং ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে অনেক মতভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন যে নির্ব্বাণ একটী আনন্দময় অবস্থা। কেহ কেহ বলেন ইহা সম্পূর্ণ ধ্বংস। বস্তুতঃ এই অবস্থার কথা ভাষায় বিবৃত করা যায় না। বৌদ্ধ মতে যখন কোনো আত্মা নাই ও কোনো স্থায়ী অবস্থা নাই তখন নির্ব্বাণে যে এই জীবনধারার দীপটী একেবারে নির্ব্বাপিত হয় এবং সর্ব্ব দুঃখ, সুখ সর্ব্ব জ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হয়, এইরূপ সিদ্ধান্তই অবলম্বন করিতে হয়।

বৌদ্ধেরা বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। ইহাদের অনেকগুলিরই পরস্পর পরস্পরে পার্থক্য আচারের

পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক এই চারিটী শাখার পরস্পরের পার্থক্য দার্শনিক মতের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। তন্মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক দুইটীই মতই সর্ব্বাস্তি-বাদ হইতে উঠিয়াছে। বৈভাষিকেরা বলেন যে সকল বস্তুই অর্থাৎ বাহ্য বস্তু এবং অন্তরে যাহা অনুভব করি, ইহার যে ভাবে প্রত্যক্ষীকৃত হয় সেই ভাবেই সত্য, কিন্তু সৌত্রান্তিকেরা বলেন যে বাহ্যবস্তুর সত্বা আমরা সেই সেই বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হইতেই প্রমাণ করিয়া থাকি। ঘটের সত্বা এইজন্যই মানি যেহেতু ঘট সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয় কাজেই বাহ্যবস্তুর সত্বা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বলিয়া মনে হইলে তাহা বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হইতে অনুমান করা হয় মাত্র। ঘট সম্বন্ধে যখন জ্ঞান হইতেছে তখন মানিতে হয় যে ঘট বলিয়া কোনো বস্তু অর্থাৎ ঘটজ্ঞানের অনুরূপ কোনো বস্তু বাহিরে আছে। কারণ, যদি সেরূপ কোনো বস্তু না থাকিত তবে ঘটের জ্ঞান হইত কেমন করিয়া! যোগা-চারীরা বলেন যে বাহ্য বস্তু নাই। আমাদের মনেরই সংস্কারবশতঃ নানারূপ জ্ঞান উঠিতেছে এবং লয় পাইতেছে। এই জ্ঞানকে বস্তু বলিয়া মনে করা ভ্রম মাত্র। মাধ্যমিক মত বা শূণ্যবাদে ইহাই তাৎপর্য্য যে

জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে এবং আমাদের মনের নানা অনুভব সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু মনে হয় তাহা সমস্তই কেবল প্রতীতি মাত্র, তাহার কোনই সত্তা নাই। তাহা সৎও নয় অসৎও নয়। তাহা উভয়ের মধ্যপদবর্ত্তী অর্থাৎ তাহা কেবল প্রতীতি মাত্র, প্রতিভাষ মাত্র। প্রতিভাষ ছাড়া তাহাদের আর কোনো অস্তিত্ব নাই। পরবর্ত্তীকালে আস্তিক মতাবলম্বী দার্শনিকেরা যখন বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তখন এই পূর্ব্বোক্ত চারিটী মতের কোনো না কোনো মতকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের তর্কযুক্তি তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সমস্ত আস্তিক্যমতের দার্শনিকেরা পালিভাষা জানিতেন বলিয়া মনে হয় না এবং পালিভাষায় লিখিত কোনো বৌদ্ধমতের তাঁহারা সমালোচনাও করেন নাই। এই মতগুলি সম্বন্ধে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে আরও কিছু বিবৃত করিয়া বলিব। যে সর্ব্বাস্তিবাদ হইতে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকদের উৎপত্তি সেই সর্ব্বাস্তিবাদের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বসুবন্ধু কৃত "অভিধর্ম্মকোষ"। এই গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকাকারে লিখিত। হিউ য়েং সাঙ অষ্টম শতকে চীনায় ইহার একটী অনুবাদ করেন। এই চীনা অনুবাদ হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে

পণ্ডিত ভালে পুস্যঁ ফরাসীতে ইহার একটী তর্জ্জমা করিয়াছেন। কিছুদিন হইল জাপানে ওগিহারা ইহার যশোমিত্র কৃত সংস্কৃত টীকাখানি রোমান অক্ষরে ছাপিয়াছেন। অভিধম্মকোষের মূল গ্রন্থ এখন প্রায় বিলুপ্ত বলিলেই হয়। এই গ্রন্থখানি বৌদ্ধ শাস্ত্রের অতি প্রকৃষ্ট গ্রন্থ।

মহাযান সম্প্রদায়ের কথা পূর্ব্বেই কিছু বলা হইয়াছে। মহাযানেরা থেরবাদী বৌদ্ধদের হীনযান বলিয়া থাকেন। পঞ্চম শতকে বসুবন্ধুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা অনঙ্গ তাঁহার মহাযান সূত্রালঙ্কারে বলেন যে হীনযানীদের এই জন্যই হীনযানভুক্ত বলা হয় যে তাহারা কেবলমাত্র তাহাদের নিজেদের নির্ব্বাণের জন্যই ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু মহাযানীরা সর্ব্বপ্রাণীর নির্ব্বাণের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বপ্রাণীর দুঃখ নিবৃত্তি এবং নির্ব্বাণ না হইলে মহাযানীরা সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। ইহাছাড়া হীনযানীরা বলেন যে সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু মহাযানীরা বলেন যে, সকল বস্তু শুধু যে ক্ষণস্থায়ী তাহা নহে, তাহারা নিঃস্বত্ব অর্থাৎ তাহাদের কোনো বাস্তবিক সত্ত্বা নেই। তাহারা কেবল প্রতীতী মাত্র, প্রতিভাব মাত্র। রজ্জুতে যেমন আমাদের সর্পভ্রম হয় এবং সেখানে যেমন সর্প প্রতীতী একেবারে সত্তাহীন প্রতিভাব মাত্র, প্রতীতী মাত্র, সেইরূপ সমস্ত

জগৎ কেবলমাত্র প্রতীতী ভ্রম। রজ্জু সর্পস্থলে রজ্জুর একটা সত্তা আছে, কিন্তু এই জগৎ-ভ্রমের অন্তরালে তাহার অধিষ্ঠান স্বরূপ কোনো সত্তা নাই। এইখানেই অদ্বৈত বেদান্তীদের সহিত বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীদের পার্থক্য; অদ্বৈত বেদান্তীরা বলেন যে সকল ভ্রমের অন্তরালে তাহাদের অধিষ্ঠান স্বরূপ একটী সত্য বস্তু আছে কিন্তু বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরা বলেন যে এই জগতে যাহা কিছু আমরা দেখি তাহা সমস্তই ভ্রম। তাহার অন্তরালে এমন কিছু নাই যাহাকে আমরা সত্য বলিতে পারি। মরীচিকায় যেমন শুধুই জলভ্রম, তাহার অন্তরালে যেমন কোনো সত্য নাই, এই জগত তেমনি নানারূপে আমাদের চক্ষুর বিভ্রম জন্মাইতেছে। ইহার অন্তরালে কোনো কিছু সত্য বস্তু নাই। অনেকে মনে করেন যে নাগার্জ্জুনই (খৃষ্টীয় ১ম শতক) প্রথম সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ যে নিঃসত্ত্ব এবং শূন্যতা মাত্র এই মত প্রচার করেন। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে। কারণ অধিকাংশ মহাযান সূত্রের মধ্যেই এই মতটী প্রচারিত হইয়াছে। নাগার্জ্জুন যাহা অনেক যুক্তি তর্কের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, মহাযান সূত্রে তাহাই বিনা তর্ক যুক্তিতে সহজ সরল সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপার-

মিতায় বুদ্ধ বলিতেছেন, ("দেখ সুভূতি, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার সমস্তই মায়া মাত্র। স্কন্ধ, ধাতু, আয়তন প্রভৃতি নিঃসত্ত্ব শূণ্যতামাত্র। এই জন্যই নিরন্তর যে নানা প্রতীতী দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতেছি ইহার অভ্যন্তরে কিছুই নাই। কোনো কিছুই নিত্যও নয় অনিত্যও নয়। সমস্তই শূণ্যতামাত্র। এই সমস্ত পৃথিবীর অন্তরালে যাহা আছে তাহা তাই মাত্র (তথতামাত্র), তাহা শূণ্য মাত্র, আমরা বলিয়া থাকি বটে যে বোধিসত্ত্বেরা যেন সমস্ত পারমিতা ধর্ম্মে সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বজীবের নির্ব্বাণের জন্য সচেষ্ট থাকেন*, কিন্তু যথার্থভাবে বলিতে গেলে কেনো বোধিসত্ত্বও নাই, কেনো বন্ধনও নাই, কেনো নির্ব্বাণও নাই, সমস্তই শূণ্যতা মাত্র।

মহাযান শাস্ত্র শূণ্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ এই দুই ভাগে বিভক্ত। বিজ্ঞানবাদ অর্থে এই কথাই বোঝায় যে জ্ঞান

* পারমিতা অর্থে পুণ্য সম্পদ বোঝায়, যেমন দানপারমিতা অর্থাৎ নিরন্তর দান করিবার প্রবৃত্তি। শীল পারমিতা অর্থাৎ চরিত্রের নির্ম্মলতা, ক্ষান্তি পারমিতা অর্থাৎ সমস্ত সহ্য করিবার ক্ষমতা। বীর্য্য পারমিতা অর্থাৎ সর্ব্বদা মঙ্গলের পথে সচেষ্ট থাকিবার ক্ষমতা, ধ্যান পারমিতা অর্থাৎ ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া প্রজ্ঞা লাভ করিবার ক্ষমতা।

ছাড়া কোনো জ্ঞেয় বস্তু নাই। যাহা কিছু জ্ঞেয় বলিয়া মনে হয় তাহা সমস্তই জ্ঞানের আকার মাত্র। সমস্ত প্রতীতীই স্বপ্নের ন্যায় কেবল ভ্রম। শূণ্যবাদীরা এই ভ্রম যে একান্ত অনির্ব্বাচ্য, কোনো প্রকার লক্ষণের দ্বারা যে ইহাদিগকে বুঝাও যায় না এই অংশেই বিশেষ ভাবে জোর দিয়াছেন।

সম্ভবতঃ লঙ্কাবতার সূত্র হইতেই বিজ্ঞানবাদের আরম্ভ। অশ্বঘোষ তাঁহার শ্রদ্ধোৎপাদ সূত্রে এই বিজ্ঞানবাদের একটী বিবরণ দেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। বসুবন্ধু প্রথমে ছিলেন সর্ব্বাস্তিবাদী এবং সেই মতানুসারে তাঁহার অভিধর্ম্মকোষ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন পরে জ্যেষ্ঠ অনঙ্গের উপদেশে বিজ্ঞানবাদ মত অবলম্বন করেন। অনঙ্গ নানা গ্রন্থ লেখেন; তাহার মধ্যে একখানির নাম যোগাচার ভূমিশাস্ত্র। সম্ভবতঃ এই নামানুসারেই আস্তিক্য দার্শনিকদের মধ্যে বিজ্ঞানবাদকে যোগাচার মত বলিয়া বলা হইত। নাগার্জ্জুন তাঁহার মাধ্যমিক সূত্রে প্রথম যুক্তিতর্ক সহকারে শূণ্যবাদ প্রচার করেন, পরেই আর্য্যদেব, চন্দ্রকীর্ত্তি প্রভৃতিরা তাঁহার গ্রন্থের উপর টীকা লেখেন। ষষ্ঠ শতকের চন্দ্রকীর্ত্তির পর শূণ্যবাদের উপর আর কোনো বিশিষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কুমারিলই অষ্টম

শতকে ইহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন তাঁহার পর শূণ্যবাদীদের সহিত আস্তিক্য মতাবলম্বী দার্শনিকদের বিশেষ কোনো বিরোধের প্রমাণ পাওয়া যায় না। শঙ্করাচার্য্য নিজে শূণ্যবাদীদের মত একরূপ বিনা তর্কেই অবহেলার বস্তু বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতের লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থের নাম, শ্রদ্ধোৎপাদসূত্র। এই গ্রন্থের মূল (সংস্কৃত) লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার চীনা অনুবাদ হইতে জাপানী পণ্ডিত Suzuki একখানি ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। ইহার দার্শনিক মতকে তথতা দর্শন বলে। তিনি বলেন যে সমস্ত বস্তুই নিজের স্বরূপে অব্যক্ত, তাহারা যাহা তাহাই। সেই তাহার কোনো স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। ইহাকে বলে ভূত তথতা। যাহাকে আমরা আত্মা বলি তাহা বস্তুতঃ নামরূপ এবং বর্ণনাহীন একটী অনির্ব্বচ্য সত্তামাত্র। তাহার স্বরূপ কোনো বাক্য দ্বারা বোঝান যায় না। এই অনির্ব্বাচ্য সত্ত্বাকে ভ্রমবশতঃ নানা রূপ ও নানা নাম দিয়া আমরা নানা ভ্রমের সৃষ্টি করিতেছি। বস্তুতঃ জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নয়। এই ভূত তথতাকে আছেও বলা যায় না, নাইও বলা যায় না। কিম্বা আছেও বটে নাইও বটে ইহাও বলা

যায় না, ইহার সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, এই হিসাবে ইহা নাই। অথচ ইহার মধ্যেই সকল জিনিষ প্রকাশ পাইতেছে, এই হিসাবেই ইহা আছে। ইহা শব্দ বিশেষ বর্জ্জিত এবং সমস্ত সীমা রেখার বাহিরে। ইহার কোনো তাত্ত্বিক রূপ নাই এই হিসাবে ইহা শূন্যতা মাত্র। এই শূন্যতা নানা নামরূপের বশবর্ত্তী হইয়া নানাভাবে প্রকাশ পাইতেছে। এই হিসাবে ইহাকে আলয় বিজ্ঞান বলা হয়। [বৌদ্ধশাস্ত্রে ধর্ম্ম শব্দের একটা বিশেষ অর্থ আছে। ধর্ম্ম অর্থ প্রতীতী মাত্র। ইংরাজীতে যাহাকে বলে appearance। প্রতীতীমাত্র বলাতেই বুঝিতে হইবে যে ইহার অভ্যন্তরে কোনো আর সত্য নাই। প্রতীতী উৎপন্ন হয় প্রতীতী বিলয় প্রাপ্ত হয়, এমনি করিয়া চলিয়াছে চারিদিকে প্রতীতীর ধারা।] এই সমস্ত প্রতীতীর মূলে একান্তভাবে অনির্ব্বাচ্য বলিয়া যাহা রহিয়াছে তাহাকেই বলা যায় তথতা। অনাদিকাল হইতে মূঢ়বিদ্যার ফলে এই একান্ত নিঃসার তথতা, জন্ম, মৃত্যু, সংসার প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহাই কর্ম্ম, কর্ম্মফলরূপে প্রতিভাত হইতেছে। যেমন মহাসাগরে ঝড় উঠিলে তরঙ্গ উঠিতে থাকে অথচ সেই তরঙ্গ মহাসাগর ছাড়া আর কিছুই নয়, তেমনি অবিদ্যাবশতঃ আলয় বিজ্ঞানই তরঙ্গিত হইয়া নানা

প্রতীতীর সৃষ্টি করিতেছে। অথচ এই অবিদ্যার কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নাই। যথার্থ জ্ঞানেরও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অবিদ্যার সঙ্গে তুলনা করিয়া আমরা যথার্থে জ্ঞান ও অজ্ঞান বলিয়া থাকি। এই দর্শনেরই বিস্তৃত বিবরণ আমার History of Indian Philosophyর প্রথম খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে। এখানে এই মাত্র বলিতে চাই যে এই সমস্ত দার্শনিকেরা উপনিষদাদি গ্রন্থে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। (বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া উপনিষদের ব্রহ্মবাদের তাৎপর্য্যের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের একটা সংমিশ্রণ ঘটাইয়া বৌদ্ধদর্শনকে একটা নূতন দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করিতেন। এই দর্শনে যে তথতার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা অনেকটা উপনিষদের ব্রহ্মের সহিত তুলনা করা যায়। পরবর্ত্তীকালে যে সমস্ত বিজ্ঞানবাদ মতের দার্শনিকেরা আপন আপন মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহাদের অনেকেরই মধ্যেই একটা স্থায়ী আলয় বিজ্ঞান মানা হইয়াছে। অনেকে সেই স্থায়ী আলয় বিজ্ঞানকে চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপও বলিয়াছেন। বসুবন্ধুর বিংশিকা ও ত্রিংশিকা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। অশ্বঘোষ বলেন যে অবিদ্যার দ্বারা বাসিত হইয়া আমাদের মধ্যে দ্বৈতবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই বিভাগ জন্মে। কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের কল্পনা হয় এবং ইহাদেরই পরস্পরের সম্পর্কে

সমস্ত জাগতিক অনুভব উৎপন্ন হয়, যদিও পরিণামে এই আলয় বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নাই এবং যদিও এই আলয় বিজ্ঞান অনির্ব্বচনীয় শূন্যতা মাত্র তথাপি, এই বোধ উৎপন্ন করিবার জন্য অন্য বৌদ্ধদের ন্যায় ইহারাও শীল সমাধি ও প্রজ্ঞাকেই একমাত্র অবলম্বন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা উপেক্ষা ছাড়া ইহাদেরও চলিবার উপায় নেই।

মাধ্যমিক মত—নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক মতে প্রধান কথাই এই যে কোনো কিছু সম্বন্ধে কোনো কিছুই বলা যায় না। কোনো কিছু বলা যায় না বলিয়াই সেগুলি সৎ-বলিয়া বলা যায় না, সমস্তই প্রতীতী মাত্র। একটি কলা-গাছের যেমন খোলের পর খোল চলিয়াছে, একটী পেঁয়াজের যেমন খোসার পর খোসা থাকে, (এই পৃথিবীর পরিদৃশ্যমান সমস্তই তেমনি দৃশ্যের পর দৃশ্য, ছবির পর ছবি, ইহাদের পিছনে কোনোও তত্ত্ব বা সত্য নাই।) এই জন্য নাগার্জ্জুনের যুক্তিপদ্ধতি বিতণ্ডামূলক অর্থাৎ তিনি কোনো পক্ষকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া মানেন না। তবে অপরে যে কেহ, যে কোনো মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করুন না কেন সেই মতই তিনি খণ্ডন করিতে প্রস্তুত। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধেরা বৌদ্ধ-দর্শন সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়া

আসিয়াছিলেন নাগার্জ্জুন প্রায় তাহার সমস্তগুলিকেই ধরিয়া ধরিয়া খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয় যে তাঁহার পূর্ব্বে আস্তিক দর্শনের মতগুলি দার্শনিক ভাবে গড়িয়া ওঠে নাই, কারণ সেই সমস্ত মত যদি তখন গড়িয়া উঠিত তবে নাগার্জ্জুন বৌদ্ধ দর্শনের মতগুলিকেই খণ্ডন করিতে কেন চেষ্টা করিবেন? পরবর্ত্তীকালে শ্রীহর্ষ বেদান্তের অনির্ব্বচনীয়তা মত সাধন করিতে গিয়া নৈয়ায়িকেরা নানা বিষয়ে যে সমস্ত লক্ষণ দিয়াছিলেন, সেইগুলিকে নাগার্জ্জুনের প্রণালীতে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়া খণ্ডণখাণ্ড নামক গ্রন্থ লেখেন। অধুনাতন কালে ইয়োরোপীয় মনীষি Bradley তাঁহার Appearance and Reality গ্রন্থে নাগার্জ্জুনের পদ্ধতিতে দ্রব্য, গুণ, সম্বন্ধ, দিক, কাল, আত্মা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদার্থগুলি যে কেবল প্রতীতী মাত্র তাহাদের যে কোনো লক্ষণ বা নির্ব্বচন করা যায় না তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

নাগার্জ্জুন তাঁহার মাধ্যমিক কারিকায় প্রতীত্য-সমুৎপাদ অর্থাৎ বৌদ্ধ কার্য্যকারণবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, প্রতীত্য-সমুৎপাদ শব্দটার একটী অর্থে এই বুঝায় যে "প্রতীত্য" অর্থাৎ হেতু ও প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়া যাহা ছিল তাহা উৎপন্ন হয়। ইহার

আর একটী অর্থ এই যে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যেকটীর বিনাশের সহিত আর একটীর উৎপত্তি হয়, এই দ্বিতীয় অর্থটী পালি ভাষায় প্রতীত্য-সমুৎপাদের যে লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে তাহার সহিত ঠিক মেলে না। সেখানে ইহাই বলা হইয়াছে "চক্ষুঃ প্রতীত্য রূপানি চ উৎপদ্যন্তে চক্ষুর্বিজ্ঞানম্" অর্থাৎ চক্ষুকে অবলম্বন করিয়া বহিস্থ রূপ ও চাক্ষুষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। নাগার্জ্জুন বলেন যে চাক্ষুষ জ্ঞানের সহিত জড় স্বরূপ চক্ষুর কোনো সংস্পর্শ ঘটিতে পারে না, সেইজন্য চক্ষুকে অবলম্বন করিয়া চাক্ষুষ জ্ঞান হয় একথা বলা চলে না। যদি ইহা বলা যায় যে কোনো কিছু ঘটিলে অপর কিছু ঘটে তাহা হইলেও কোনো বিশেষ ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। কোনো কিছুই উৎপন্ন হইতে পারে না। উৎপন্ন হইতেছে এই বোধটী একটী মিথ্যাবোধ কারণ কোনো কিছু যেমন আপনা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না তেমনি অপর হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে না। তেমনি আপন এবং অপর এই উভয় হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে না। বস্তুটী যদি পূর্ব্ব হইতেই থাকে তবে তাহার দ্বারা তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। যদি অপর কিছু হইতে তাহার উৎপন্ন হয় তবে তাহাই বা কি করিয়া হইবে কারণ যাহা ছিল তাহা উৎপন্ন কেমন

করিয়া হইবে। যাহা ছিল তাহা উৎপত্তি ক্রিয়ার কর্তা হয়। যদি কোনো কিছুর উপর অবলম্বন করিয়া অপর কোনো বস্তু উৎপন্ন হয় তবে আলোকে অবলম্বন করিয়াও অন্ধকার উৎপন্ন হইতে পারে। যদি নিজে হইতে কোনো বস্তু উৎপন্ন না হয় তবে অপর হইতেই বা তাহা কি করিয়া উৎপন্ন হইবে আর ইহা সম্ভব না হইলে নিজে এবং অপর এই উভয়ের দ্বারাই বা কি করিয়া উৎপন্ন হইবে, আর বিনা কারণেই বা কি করিয়া বস্তু উৎপন্ন হইবে। কাজেই ইহা মানিতে হয় যে প্রতীত্য-সমুৎপাদ বলিতে বৌদ্ধরা যা বুঝিতেন তাহা কোনো যথার্থ উৎপত্তি নহে তাহা কেবল-মাত্র ভ্রমের বিলাস। প্রতীত্য-সমুৎপাদ নিয়মের কোনো সত্যতা নাই, ইহা অবিদ্যাশ্রিত ভ্রম মাত্র। একমাত্র নির্ব্বাণই হইতেছে তাহা যাহার কোনো বিনাশ নাই বা যাহা কখনও লুপ্ত হয় না, আর যাহা কিছু উৎপন্ন বা বিনষ্ট হইতেছে বলিয়া মনে হয় তাহা মরীচিকার ন্যায় ভ্রম মাত্র। এইরূপ ভাবে নাগার্জ্জুন নানা বৌদ্ধ মত সমালোচনা করিয়া ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে যাহা কিছু আমরা দেখি বা ভাবি তাহা সমস্তই সৎও নয় অসৎও নয়, প্রতীতি মাত্র। এই প্রতীতির মূলে কিছুই নাই, ইহা, কদলীকাণ্ডের ন্যায় অন্তঃসারবিহীন।

ইহার উত্তরে যদি ইহা বলা যায় যে যদি কিছুই না থাকে তবে এত ধর্ম্ম উপদেশের ঘটা কেন। ইহার উত্তরে নাগার্জ্জুন বলিবেন যে তোমরা সকলে জগৎকে সত্য বলিয়া মনে কর সেইজন্যই ত দুঃখ পাও। সেইজন্যই বুঝাইয়া দেওয়া দরকার যে যাহা দেখিতেছ, শুনিতেছ তাহার কিছুরই কোন সত্তা নাই। মনে করিতেছ তোমাদের মন আছে, চিত্ত আছে কিন্তু এই চিত্তকে তোমরা কখনও দেখিতে পাও না, যাহা দেখিতে পাও না তাহা পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও নাই, পরেও থাকিবে না। ইহার কোনো সত্তাও নাই, স্বরূপও নাই, উৎপত্তিও নাই, ধ্বংসও নাই। যে এই কথাটী না বোঝে সেইই সংসারচক্রে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। শূণ্যবাদ মতে প্রতীত্য সমুৎপাদের এই তাৎপর্য্য যে জগতে যাহা কিছু দেখিতেছি তাহা অন্তঃসারশূণ্য প্রতীতীমাত্র। নাগার্জ্জুন বলেন কোনো বস্তুরই কোনো স্বভাব নাই। সকল স্বভাবই আপেক্ষিক মাত্র। কতকগুলি প্রতীতীর উপর অবলম্বন করিয়া কতকগুলি প্রতীতী ফুটিয়া ওঠে। কার্য্যকারণ ভাবেরও কোনো অর্থ নাই। কারণ কোনো প্রতীতীর যদি আপন কোনো স্বভাব না থাকে তবে তাহা অপর কোনো প্রতীতীর কোনো স্বভাব উৎপন্ন করিতে পারে না। যেমন কোনো

বস্তু সম্বন্ধে "ইহার এই স্বভাব" একথা বলা যায় না, তেমনি কোনো বস্তু সম্বন্ধে "ইহার ইহা স্বভাব নয় তাহা বলা যায় না।" কারণ ভাব অভাব দুইই মিথ্যা। যদি বস্তুকে ক্ষণিক বলিয়া মানা যায় তবে জগৎকে চঞ্চল স্বভাব বলা যায় না। যাহা প্রতীত হয় তাহা কোনখান হইতে আসে না বা কোথাও যায় না। প্রত্যেক প্রতীতীই যদি ক্ষণস্থায়ী হয় তবে তাহাদের মধ্যে কোনো কার্য্যকারণ বিভাগ থাকিতে পারে না। আস্তিক্য মতের দার্শনিকেরা স্বতন্ত্র আত্মা মানিয়া থাকেন, কিন্তু নাগার্জ্জুন বলেন যে পঞ্চ স্কন্ধের প্রতীতী ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই না। নাগার্জ্জুন নির্ব্বাণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে জগতের স্বভাবই নির্ব্বাণ, নির্ব্বাণ অর্থ নিঃসারতা। সমস্ত প্রতীতীর, সমস্ত ধর্ম্মের উৎপত্তিও নাই নিরোধও নাই, সেইজন্য নির্ব্বাণ ভাবও নয় অভাবও নয়। নির্ব্বাণ অবস্থায় কোনো জ্ঞানও নাই কোনো প্রতীতীও নাই। প্রতীতী যে ধ্বংস হইয়াছে তাহারও বোধ নাই। স্বয়ং বুদ্ধও মায়া মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই কোনো বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই। কিন্তু যদিও নাগার্জ্জুন এই-ভাবে সম্পূর্ণরূপে জগতের পরমার্থতা ও সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন এবং সমস্ত সত্তাই ব্যবহারিক মাত্র, সংবৃতি মাত্র

তথাপি এই বোধ উৎপন্ন করাইবার জন্য অন্যান্য বৌদ্ধদের ন্যায় শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা অনুসরণের কথা বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার সুহৃল্লেখ গ্রন্থে আমরা আমাদিগকে কিরূপে বিশুদ্ধ করিয়া মাধ্যমিক দর্শনের দৃষ্টির অধিকারী হইতে পারি সে বিষয়ে বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার History of Indian Philosophyর প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞানবাদ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গুণ বা দ্রব্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি সেগুলিকে বৌদ্ধ দর্শনে ধর্ম্ম বলিত। বিজ্ঞানবাদীরা বলেন যে সমস্ত ধর্ম্মই মনঃকল্পিত। বাহিরের জগৎ বলিয়া কিছু নাই এবং তাহার মধ্যে যে নিরন্তর প্রবাহ চলিতেছে বলিয়া মনে করি তাহা নাই। সমস্ত বাহিরের জগৎ আমাদেরই কল্পনায় নির্ম্মিত হইয়া আমাদিগকেই বিমুগ্ধ করিতেছে। আমাদের জ্ঞানে দুইটী স্বতন্ত্র বৃত্তি পাই। একটীতে আমরা সমস্ত দৃশ্য বস্তুর সৃষ্টি করি—ইহাকে বলে খ্যাতি বিজ্ঞান, এবং অপরটীতে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করি—ইহাকে বলে বস্তু প্রতি বিকল্প বিজ্ঞান। ইহারা উভয়ে পরস্পরকে নিয়ন্ত্রিত করে। অনাদিকাল হইতে এইধারা চলিয়াছে। আমাদের অন্তরস্থ বাসনা হইতেই এই সৃষ্টি চলিয়াছে। এই সৃষ্টির কোন

স্বতন্ত্র স্বভাব নাই। ইহা নিঃস্বভাব, মায়া মাত্র। আমাদের চিত্ত হইতেই নিরন্তর নানা প্রতীতীর উৎপত্তি হইতেছে। কিন্তু যে চিত্ত হইতে ইহা উৎপন্ন হইতেছে এবং যে চিত্ত জ্ঞাতা জ্ঞেয় রূপে আপন জ্ঞানকে বিভক্ত করিতেছে তাহার কোনো সত্তা নাই, কোনো ধ্বংসও নাই। তাহা উৎপাদ-স্থিতি-ভঙ্গ বিবর্জ্জিত। ইহাকে বলে আলয় বিজ্ঞান। লঙ্কাবতার সূত্রে এই শ্রেণীর বিজ্ঞানবাদ প্রচারিত হইয়াছে কিন্তু কোনো বিষয়েরই যদি কোনো সত্তা বা স্বভাব না থাকে তবে কি করিয়া একথা মানা যায় যে অবিদ্যার দ্বারা আলয় বিজ্ঞান চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে এবং তাহারই ঢেউগুলি দ্রষ্টা বা জ্ঞাতা তাঁহার জ্ঞান এবং বাহ্যস্থ বিষয় বস্তুরূপে প্রতিভাত হইতেছে। নিপুণ করিয়া দেখিলে মনে হয় যে লঙ্কাবতারে একটী পরমার্থ মত ও একটী ব্যবহারিক মত প্রচারিত হইয়াছে। পরমার্থ দৃষ্টিতে কোনো কিছুরই কোনো স্বভাব নাই। সমস্তই যেন শূন্যতা মাত্র। এই অংশে ইহা নাগার্জ্জুনের মতের তুল্য। আবার অপরদিকে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয় আলয় বিজ্ঞান অবিদ্যার ঝটিকায় আন্দোলিত হইয়া জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও বিষয়বস্তুরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অশ্বঘোষের মত উপনিষদের দ্বারা প্রভাবিত।

আবার লঙ্কাবতারের মত যেন নাগার্জ্জুনের মতের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু কি নাগার্জ্জুন, কি লঙ্কাবতার কেহই আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানকে যথার্থ ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই এবং অবিদ্যার সহিত চরম সত্যের কি সম্পর্ক তাহাও ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই, চরম সত্য যদি না থাকে অবিদ্যাই বা কোথা হইতে আসে।

লঙ্কাবতার ও নাগার্জ্জুনের অনুবর্ত্তীকালে বিজ্ঞানবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন, মৈত্রেয় এবং অনঙ্গ। ইহাদেরই মত সংস্কার করিয়াছিলেন বসুবন্ধু তাহার বিংশিকা ও ত্রিংশিকায়। তাঁহারা ইহাই প্রমাণ করিতে সচেষ্ট ছিলেন যে বাহিরের জগতের কোনো সত্তা নাই। কেবল একটীই মাত্র পরমার্থভাবে সত্য। সেই একটী চিন্ময় স্বরূপ হইতে একদিকে যেমন আমরা আমাদিগকে জ্ঞাতা ও ভোক্তা বলিয়া মনে করি, অপরদিকে তেমনি বাহিরের জগতের সত্তাও স্বীকার করি। সমস্তই চিত্তের কল্পনামাত্র। চিত্তের একজাতীয় কল্পনায় মনে হয় যেন বস্তুগুলি আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, তখনই আমারা তাহাকে বলি প্রত্যক্ষ। চিত্তের অন্য জাতীয় কল্পনায় আমাদের মনে হয় যেন বস্তুগুলি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, এখন স্মরণ হইতেছে। তাহা হইলে এইরূপ মানিতে হয় যে আমাদের

প্রত্যেকের মধ্যে এক একটী প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির ধারা চলিয়াছে। এই ধারাকে বলে "সন্তান"। অথচ এই প্রত্যেকটী ব্যক্তির মধ্যের সন্তানধারা অপর ব্যক্তির সন্তান-ধারাকে বিভিন্ন ভাবে অভিভাবিত করিতে পারে। আমি যখন মনে করি অর্থাৎ আমার মধ্যের সন্তানধারা যখন এই বোধ হয় যে আমি বধ করিতেছি, তখন নিহত ব্যক্তির মধ্যে এই বোধ হয় যে সে হত হইল। যে শক্তিতে এক-দিকে জ্ঞানধারা সৃষ্টি করিতেছে তাহাতেই যেন বহির্জ-গতের জ্ঞেয় রূপ ও বস্তু রূপ সৃষ্ট হইতেছে। ইহাকেই বলা যায় কার্য্য-কারণবাদ। আলয় বিজ্ঞান হইতে বাহিরের ধারা এবং ভিতরের ধারা, এই দুই ধারায় বাহ্য রূপ এবং অন্তরের জ্ঞান সৃষ্ট হইতেছে। অশ্বঘোষের তথতাবাদে বাহ্য রূপ যেমন একান্ত মিথ্যা, বসুবন্ধুর বিজ্ঞানবাদে ঠিক সেরূপ নয়, বসুবন্ধুর বিজ্ঞানবাদে যাহা জ্ঞেয় বলিয়া মনে হইতেছে তাহাও ব্যবহারিক ভাবে আলয় বিজ্ঞান হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যমতে যেমন বুদ্ধি ও অহংকার এবং বাহিরের সমস্ত বস্তু প্রকৃতিরই পরিণামে উৎপন্ন এখানে সেরূপ নয়। আলয় বিজ্ঞানের কোনো তাত্ত্বিক পরিণাম হয় না। কেবল মাত্র অনাদিকাল হইতে আগত বাসনা ও সংস্কারের দ্বারা আলয় বিজ্ঞান হইতেই দুই ধারায়

জ্ঞেয় ও জ্ঞান প্রতিভাত হয়। এই দুই ধারার, একটি অন্তরের, এবং তাহাকেই বলা হয় মনন অর্থাৎ মানসিক চিন্তা, তর্ক ইত্যাদি। অপর ধারাটি বাহিরের এবং তাহাকেই অবলম্বন করিয়াই ইহা জানিতেছি, উহা জানিতেছি এইরূপ ভাবে বহির্বিষয়ের জ্ঞান হয়। ইহাকে বলা হয় বিষয় বিজ্ঞপ্তি। আলয় বিজ্ঞানের মধ্যে অনাদি কাল হইতে নানারূপ বাসনা ও সংস্কার সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে এইজন্যেই ইহাকে বলে আলয় বিজ্ঞান অর্থাৎ যে বিজ্ঞান সমস্ত সংস্কারের আলয় বা গৃহ। আলয় বিজ্ঞানের মধ্যে যে সমস্ত সংস্কারের বীজ আছে তাহারই ফলে বহির্লোকে বাহিরের আকাশের মধ্যে যেন নানা বস্তু রহিয়াছে এবং আমরা যেন আমি রূপে সেই সব দেখিতেছি এইরূপ বোধ উৎপন্ন হয়। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয় ও পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের বিষয় পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশিত হয়। [জ্ঞান ছাড়া এই সমস্ত বিষয়ের অন্য কোনো সত্তা নাই।] বিজ্ঞান-বাদীরা বলেন যে, যে দুইটী বস্তু একই সময়ে উপলব্ধ হয় বা জানা যায় তাহারা বিভিন্ন নহে, জ্ঞানের বিষয় যেমন ঘট ও সেই বিষয়ের জ্ঞান যেমন ঘটজ্ঞান এই উভয়েই এক সময়ে পাওয়া যায়। যে সময়ে বাহিরে কলসটী দেখি সেই সময়েই কলসের দেখাটী নিষ্পন্ন হয় এই যুক্তিতে ইহাই

বলিতে হয় যে কলস এবং কলসের জ্ঞান ভিন্ন নহে। সমস্তই জ্ঞানের আকার মাত্র। অশ্বঘোষ যে আলয় বিজ্ঞানের কথা বলিয়াছেন সে আলয় বিজ্ঞান একেবারেই অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু বসুবন্ধু বলেন যে এই আলয় বিজ্ঞানই আপনা হইতে যেন বিভক্ত হইয়া বাহিরের জানিবার বস্তু এবং অন্তরের জ্ঞান এই উভয়কে সৃষ্টি করিয়া থাকে। বসুবন্ধুর আলয় বিজ্ঞানকে আমরা খানিকটা পরিমাণে সাংখ্যের কারণ বুদ্ধির সহিত তুলনা করিতে পারি। একই কারণ বুদ্ধি যেমন বিভক্ত হইয়া নানা ব্যক্তির মধ্যে সেই সেই ব্যক্তির বুদ্ধি রূপে কাজ করে, তেমনি একই আলয় বিজ্ঞান নানা ব্যক্তির মধ্যে নানা সন্তানধারায় প্রকাশ পায়। বসুবন্ধু বলেন যে আলয় বিজ্ঞান একটী সচ্চিদানন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বস্তুকে আলয় বিজ্ঞান রূপে না ভাবিলে জাগতিক নানা অনুভবের ব্যাখ্যা করা যায় না। এই রূপে সচ্চিদানন্দ বস্তুগুলিকে যদি মানিতে হয় তবে অদ্বৈত বেদান্তের সহিত ইহার পার্থক্য অতি অল্পই ঘটে। পরবর্ত্তীকালে শঙ্করাচার্য্য যে অদ্বৈত বেদান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মূলতঃ তাহা বসুবন্ধুর মতেরই একটা নূতন সংস্করণ বলিয়া মনে হয়।

পরবর্ত্তীকালে শান্তরক্ষিত ও কমলশীল ইহাই প্রমাণ

করিতে চেষ্টা করেন যে সম্বন্ধ বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা সমস্তই মায়ার কল্পনা। দ্রব্যগুণের কিম্বা দ্রব্য ও জাতির যে বিভাগ আমাদের সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে তাহা মনঃকল্পনা মাত্র। প্রত্যক্ষের দ্বারা আমরা যাহা গ্রহণ করি তাহা একান্ত অনির্ব্বাচ্য ও নির্ব্বিকল্প, তাহাই যথার্থ প্রমাণ। এই নির্ব্বিকল্প ও অব্যক্ত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর আমাদের অন্তরের সংস্কার ও স্মৃতির দ্বারা নানারূপ বিভাগ ও বিশেষণ ও সম্বন্ধ আরোপিত হইয়া বস্তু সম্বন্ধে নানা সম্বন্ধের ও নানা আকারের জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথম মুহূর্ত্তে আমাদের চক্ষুর সঙ্গে যখন কোনো বস্তুর সম্পার্ক ঘটে তখন যে জ্ঞানটী হয় তাহা একান্ত অস্ফুট ও অনির্ব্বাচ্য। আমাদের অন্তরের অভ্যন্তর হইতে সংস্কার ও স্মৃতির ফলে সেই জ্ঞানের উপর নানারূপ সম্বন্ধ ও বিশেষণ আরোপিত হইয়া সেই জ্ঞানটীকে স্ফুট করিয়া তোলে—আমরা বলি গাছের ফুল ফুটিয়াছে, এই জন্য স্ফুট জ্ঞানরূপে আমরা যাহা দেখি তাহা সমস্তই মিথ্যা। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। জ্ঞানই বহিরাকারে বস্তু রূপে প্রতিভাত হয়, কাজেই বস্তুর সঙ্গে মিলিল কিনা এইভাবে জ্ঞানের সত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব পরীক্ষা করা যায় না। শান্তরক্ষিত ও কমলশীল বসুবন্ধুর

আলয় বিজ্ঞান বা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা স্বীকার করেন না। বিভিন্ন বিন্দু হইতে যে সমস্ত বিভিন্ন জ্ঞান ধারা উৎপন্ন হইতেছে এবং বিবিধ ব্যক্তির স্থষ্টি করিতেছে তাহারা সকলেই পৃথক। বসুবন্ধু যেমন বলেন যে একটী আলয় বিজ্ঞানই একমাত্র সত্যবস্তু, কমলশীল তাহা মানেন না, কাজেই কমলশীলের মতকে অদ্বৈত বাদ বলা যায় না, কমলশীল ও শান্তরক্ষিত আস্তিক দর্শনের প্রত্যেকটী মত তত্ত্ব সংগ্রহে ও তাহার টীকায় খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সৌত্রান্তিক—খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে ধর্ম্মকীর্ত্তি তাঁহার ন্যায়বিন্দু লেখেন ও খৃষ্টীয় নবম শতকে ধর্ম্মোত্তর ইহার টীকা লেখেন। এই বইখানি সৌত্রান্তিকদের তত্ত্বগ্রন্থ। এই গ্রন্থে সম্যক জ্ঞান ও যথার্থ জ্ঞানের লক্ষণ দিতে গিয়া ইহারা বলেন যে, যে জ্ঞান না হইলে আমরা যাহা চাই তাহা পাইতে পারি না তাহাকেই সম্যক বলে। যখন আমাদের কোনো জ্ঞান হয় এবং সেই জ্ঞান অনুসারে কাজ করিয়া আমরা ফল পাই তাহাকেই আমরা সম্যক জ্ঞান বলি। জ্ঞান অনুসারেই আমাদের প্রবৃত্তি ঘটে। এই প্রবৃত্তি অনুসারে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়াছি সেইরূপ বস্তুই যদি বাহিরে পাই তাহা হইলেই বুঝিতে পারি যে আমাদের জ্ঞানটী যথার্থ। বস্তু পাওয়া পর্য্যন্ত

জ্ঞানের কাজ চলে এবং বস্তুর পাওয়াতেই জ্ঞানের কার্য্য শেষ হয়। আমাদের পিপাসা পাইয়াছে, দেখিলাম সম্মুখে এক গেলাস জল, তাহা পাইবার জন্য হাত বাড়াইলাম এবং সেই অনুসারে গেলাসটী পাইয়া জল পান করিলাম। বস্তু প্রাপ্তির জন্য এবং এই জগতে আমরা যাহা যাহা চাই তাহা পাইবার জন্য জ্ঞানই আমাদের প্রধান অবলম্বন। যেখানে জ্ঞান অনুসারে বস্তু পাওয়া যায় না, সেখানে সেই জ্ঞানটীকে মিথ্যা বলিতে হয়। দেখিলাম পায়ের কাছে কি যেন চক্‌চক্ করিতেছে মনে হইল এটা একটা দোয়ানি না হইয়া যায় না; হাত বাড়াইয়া তুলিতে গেলাম, যাহা পাইলাম তাহা কাছে আনিয়া দেখি যে সেটা একটা ঝিনুকের টুক্‌রা। এইখানেই হইল শুক্তিতে রজতভ্রম। যাহা দেখিলাম তাহা পাইলাম না। কিন্তু সকল বৌদ্ধরাই বলেন যে, সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক, কাজেই যে মুহূর্ত্তে আমরা কোনো বস্তু দেখি সেই বস্তু সেই মুহূর্ত্তেই ধ্বংস হইয়া যায়। কাজেই যে বস্তুটী আমরা দেখি সেই বস্তুটীকে আমরা পাইতে পারি না। কিন্তু যে বস্তুটীকে দেখি তাহারই প্রতিক্ষণে উৎপন্ন তৎসদৃশ যে সন্তানধারা চলিতে থাকে তাহারই একটীকে পাইতে পারি। দেখিলাম একটী নীলপদ্ম সম্মুখে রহিয়াছে, দেখার

পরক্ষণেই যে নীলপদ্মটা দেখিয়াছিলাম তাহার ধ্বংস হইল, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই আবার নূতন একটা নীলপদ্ম সেই বিনষ্ট নীলপদ্মের স্থানে উৎপন্ন হইল। এমনি করিয়া প্রতিক্ষণে একটা নীলপদ্ম বিনষ্ট হয় এবং আর একটা নীলপদ্ম উৎপন্ন হয়। এমনি করিয়া চলিয়াছে বিনষ্ট ও উৎপন্ন নীলপদ্মের সন্তানধারা। ইহারা পরস্পর এক নহে সদৃশ মাত্র, কাজেই যে ক্ষণে নীলপদ্ম স্পর্শ করিলাম সেই স্পর্শক্ষণের নীলপদ্মটা যে নীলপদ্মটা দেখিয়াছিলাম সেই নীলপদ্মের সহিত অভিন্ন বা এক নহে, কিন্তু তাহারা পরস্পর সদৃশ মাত্র। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রত্যক্ষের প্রথম মুহূর্ত্তে আমরা যাহা দেখি তাহাতে কোনো স্ফুটতা থাকে না। তাহা কোন্ জাতীয়, কী নাম, তাহার কী গুণ ইত্যাদি কিছুই জানা থাকে না। এইগুলি জানার নাম কল্পনা। পর মুহূর্ত্তে নানা কল্পনা সেই মূঢ়, অস্ফুট জ্ঞানের সহিত যুক্ত হয়। এই কল্পনার সহিত যুক্ত হওয়ার নাম অভিলাষ। এ সমস্তগুলিই আমাদের মনের কার্য্য। এগুলি বস্তু হইতে উৎপন্ন নহে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় স্বরূপের দ্বারা বস্তু সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়, কাজেই তাহা যে কী তাহা বলা যায় না। সেইজন্য প্রথম মুহূর্ত্তের সেই জ্ঞানকে স্বলক্ষণ

বলা হয়। এই মতের সহিত ইয়োরোপীয় দার্শনিক Kant-এর মতের সাদৃশ্য আছে। এই জ্ঞানেরই যথার্থ প্রামাণ্য। এই জ্ঞানটী বস্তুর যথার্থ স্বরূপকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। পরে নানা সম্বন্ধের দ্বারা যখন আমরা অস্ফুট জ্ঞানকে স্ফুটরূপে উপলব্ধি করি তখন সেই স্ফুট জ্ঞানটীকে বস্তুর যথার্থ ছবি বলিয়া মনে করিতে পারি না, কারণ তাহার অনেকখানিই আমাদের মন হইতে দেওয়া।

বৌদ্ধ দর্শনে কোনো বস্তু যে স্থায়ী তাহা মানা হয় না। কোনো বস্তুই এক ক্ষণের অধিক থাকে না, সেইজন্য বৌদ্ধ দর্শনে কোনো আত্মাও মানা হয় না, ঈশ্বরও মানা হয় না। আত্মা মানা হয় না অথচ জন্মান্তর কেমন করিয়া মানা হয়, সে সম্বন্ধে অনেকের মনে সংশয় উঠিয়া থাকে। আত্মা না থাকিলে কাহার জন্ম? বৌদ্ধ দর্শনে শুধু যে আত্মা মানা হয় না তাহা নয়, সকল বস্তুই নানা ধর্ম্মের সমষ্টিতে নির্ম্মিত। যাহা আমরা এক বলিয়া মনে করি তাহা নানা প্রতীতীর সমষ্টি মাত্র। মিলিন্দপঞ্হে ভদন্ত নাগসেন বলিয়াছিলেন যে রথ বলিয়া কোন একটী বস্তু নাই, আছে তাহার নানা অংশ। এই নানা অংশের যুগপৎ প্রতীতীতে যেন একটী রথ দেখিতেছি এইরূপ মনে হয়। বৌদ্ধ দর্শনে অবয়ব বা part মানা হয়, কিন্তু অবয়বী বা whole মানা

হয় না, সমবায় সম্বন্ধ মানা হয় না। জাতি বা class concept মানা হয় না। অবয়বী মানা হয় না বলিয়াই অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মিলিয়া একটা স্বতন্ত্র অখণ্ড বস্তু হয় ইহাও মানা হয় না। নৈয়ায়িকেরা বলিতেন বা বলেন যে দুই বা ততোধিক খণ্ড বা ভাগ যখন সমবায় সম্বন্ধে একত্রিত হয় তখন একটী অবয়বী বা whole-এর সৃষ্টি হয়। সমবায় সম্বন্ধ মানা হয় না বলিয়া বৌদ্ধেরা অবয়বী বলিয়া কিছু আছে তাহা স্বীকার করেন না। যাহা অবয়বী বলিয়া আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় তাহা কেবল সেইরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র, কিন্তু তাহার কোনো স্বতন্ত্র বস্তু-সত্তা নাই। কেবলমাত্র মনের ভুলে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন যে সমস্ত পদার্থ একটী ক্ষণে ঘটে এবং একত্র মিলিত হইয়া যখন তাহারা একটী কার্য্য সাধন করে তখন সেগুলিকে একত্রিতভাবে আমরা একটী বস্তু বলিয়া মনে করি। কতকগুলি পরমাণু মিলিয়া একখণ্ড কাঠ। বস্তুতঃ, একখণ্ড কাঠ বলিয়া কোনো কিছুই নাই, আছে কেবল কতকগুলি পরমাণু। বিভিন্ন বস্তু যে এইভাবে একটী বস্তু বলিয়া মনে হয় ইহাকে বলা যায় প্রজ্ঞপ্তি সৎ, অর্থাৎ যাহা প্রজ্ঞপ্তিতে বা জ্ঞানের চক্ষুতে এক বলিয়া মনে হয় অথচ যাহা বস্তুতঃ এক নহে। এই দৃষ্টিতে দেখিলে আত্মা

বলিয়া যাহা আমাদের কাছে মনে হয় তাহা রূপ, বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা ও সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নহে। এগুলির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এইগুলি আমাদের বুঝিবার ভুলে যখন একত্রিত হইয়া একটী বস্তুরূপে প্রতিভাত হয় তখন সেইটীকে আমরা আমি বা আত্মা মনে করি। রূপ, বেদনা প্রভৃতি স্কন্ধগুলি যেমন প্রকাশ পাইতেছে তেমনি পরমুহূর্ত্তে ধ্বংস হইতেছে। প্রতি ধ্বংস হইতে তাহারই শক্তিতে আবার পরক্ষণে নূতন পঞ্চ স্কন্ধ প্রতিভাত হইতেছে। এমনি করিয়া পূর্ব্বক্ষণে বিনষ্ট পঞ্চ স্কন্ধের বলে নূতন পঞ্চ স্কন্ধের উদয় হইতেছে। এমনি করিয়া ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে পঞ্চ স্কন্ধ সমষ্টিরূপ আত্মার ধারা প্রতি ক্ষণে বিনষ্ট হইয়া প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে। আমাদের সমস্ত জীবন ভরিয়া এই পঞ্চ স্কন্ধেরই নূতন নূতন উদয় ও নূতন নূতন ধ্বংস আবার নূতন নূতন উদয়ধারা ক্রমে চলিয়াছে। একটীক্ষণের প্রদীপশিখা হইতে যেমন পরক্ষণের প্রদীপ শিখা হয় তেমনি প্রতিক্ষণের পঞ্চস্কন্ধের ধ্বংসের সঙ্গে পরক্ষণের পঞ্চস্কন্ধের উদয় হয়। এমনি করিয়া চলিয়াছে আমাদের সমস্ত জীবৎকালকে ব্যপ্ত করিয়া পঞ্চস্কন্ধের নিরন্তর উৎপত্তি ও বিনাশের ধারা। মৃত্যুতে এই ধারারই একটী নূতন দেহে নূতন প্রকাশ। এই দেহ এবং চিত্ত

যেমন জীবৎকালে কতকগুলি ধর্ম্মের সমষ্টিরূপে ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে নূতন নূতন উৎপত্তি ও নূতন নূতন বিনাশ চলিয়াছে মৃত্যুতেও ঠিক তাহাই ঘটে। তবে বর্ত্তমান জীবনে খানিকটা কাল যেমন একটা দেহের সহিত অন্য কালে উৎপন্ন দেহের একটা সাদৃশ্য দেখিয়া যেন একটা মানুষকেই দেখিতেছি এইরূপ মনে হয়. মৃত্যুর পরে যে জন্ম হয় তাহাতে সেইরূপ দেহগত সাদৃশ্য থাকে না, কিন্তু নির্ব্বাণ হওয়া পর্য্যন্ত একই ধারা দেহ হইতে দেহান্তরকে আশ্রয় করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তৃষ্ণা ও কর্ম্মই এই ধারাকে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। এইভাবে দেখিলে সহজেই বুঝা যায় যে স্থায়ী আত্মা না মানিলেও জন্ম হইতে জন্মান্তরে পঞ্চস্কন্ধের বিনাশ ও উৎপত্তি সহজেই মানা যায়। একই কর্ম্ম তৃষ্ণা হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রতিক্ষণের উৎপন্ন সমষ্টির ধারাকে আমরা যেন একই ব্যক্তির বিনাশ ও উৎপত্তি হইতেছে এইরূপ মনে করিতে পারি, পূর্ব্বক্ষণের কর্ম্ম ও তৃষ্ণাকে অবলম্বন করিয়া পরক্ষণের সমষ্টির উৎপত্তি এবং এই হিসাবেই আমরা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকি। বস্তুতঃ যে স্কন্ধসমষ্টি একটা কর্ম্ম করে তাহার ফল ভোগ করে তাহার পরবর্ত্তী কোনো ক্ষণের সমষ্টি। তৃষ্ণা ও কর্ম্ম বিনষ্ট হইলে এই ধারাস্রোত বন্ধ

হইয়া যায়, ইহাকেই বলে নির্ব্বাণ। ধারারূপে দেখা ছাড়া কোনো কিছুরই কোনো স্বরূপ নাই বলিয়া বিজ্ঞানবাদে ও শূন্যবাদে সকল বস্তুকে নিঃস্বভাব বলা হইয়াছে।

[এক সময় বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে জগতের কোনো কর্ত্তা আছে কি না? জগৎ নিত্য কি অনিত্য? বুদ্ধ বলিয়াছিলেন এই সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। ইহাতে আধুনিক কালের কোনো কোনো পণ্ডিত অনেক যুক্তি তর্কসহকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বুদ্ধ যখন স্পষ্টতঃ ঈশ্বর মানেন না একথা বলেন নাই তখন তিনি ঈশ্বর মানিতেন। এইমত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যে মতে সমস্তই ক্ষণিক, সমস্তই হেতু প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন সে মতে স্থায়ী ঈশ্বর মানা যে সম্ভব হয় না ইহা সহজেই বুঝা যায়। বীজ হইতে যখন অঙ্কুর হয় তখন বীজকে অঙ্কুরের হেতু বলি; আবার বীজের মধ্যে যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, ও মরুৎ এই চারিভূতের পরমাণু আছে তাহাই অঙ্কুরের মধ্যে যে ওই চারিভূতের একটা নূতন অবস্থায় স্থিতি আছে তাহার প্রত্যয় বলিয়া বলা হয়। এই হেতু এবং প্রত্যয় অবলম্বন করিয়াই সমস্ত কিছুর উৎপত্তি এবং বিনাশ। কাজেই ঈশ্বর বলিয়া কার্য্য-কারণের অতীত কোনো একটী সংবস্তু বা পুরুষ মানা যায় না এবং সেই কারণে স্বতন্ত্রভাবে

যে কোনো স্থায়ী আত্মা আছে তাহাও মানা যায় না। এই জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মকে নৈরাত্মবাদ বলে।]

বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যেরা তাঁহার রচনাবলী সংগ্রহ করিয়া যে গ্রন্থরাশি পালিভাষায় রচনা করেন তাহাকেই অবলম্বন করিয়া হীনযান বৌদ্ধমত বা থেরবাদী বৌদ্ধমত উৎপন্ন হয়। এই মত ভারতবর্ষে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্য্যন্ত বুদ্ধঘোষের আমল পর্য্যন্ত প্রবলভাবে চলে। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধপ্রশিষ্যদের যে একটী নূতন ধরণের মত ও ব্যাখ্যা আবির্ভূত হয় এবং সেই মতকে অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় যে সমস্ত বৌদ্ধগ্রন্থ লেখা হয় তাহাই মহাযান মত বলিয়া প্রসিদ্ধ একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয়, তৃতীয় শতক হইতে এই মহাযান মতের সহিত আস্তিক মতের দার্শনিকদের প্রবল বিরোধ উপস্থিত হয়। উপনিষদবাদীরা বলিতেন যে আত্মা অবিনাশী এবং ইহা আনন্দস্বরূপ। বৌদ্ধেরা বলিতেন আত্মা নাই এবং জগৎ দুঃখময় ও ক্ষণিক। মূলে দার্শনিক মতের এই পার্থক্য অবলম্বন করিয়া উভয়দলের দার্শনিকদের মধ্যে অন্যান্য নানা বিষয়ে অনেক মতভেদ ঘটে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয়, তৃতীয় শতক হইতে খৃষ্টীয় একাদশ, দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত

আস্তিক মতের দার্শনিকদের তর্কগ্রন্থে সর্ব্বদা বৌদ্ধদের সহিত প্রবল দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও ইহা অস্বীকার করা যায় না যে উভয় দলের দার্শনিকেরাই পরস্পরের মতের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। উপনিষদের মতে প্রভাবিত হইয়া বসুবন্ধু সচ্চিদানন্দ তত্ত্বকে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য বৌদ্ধেরা তাহা স্বীকার করেন নাই আবার শঙ্করাচার্য্য যখন একমাত্র ব্রহ্মকে সত্য মানিয়া আর সমস্তকেই মায়ার বিকার বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন, যখন পরমার্থ সত্য, ব্যবহারিক সত্য ও প্রাতিভাসিক সত্য বলিয়া সত্যের নানা বিভাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, তখন স্পষ্টতই তাঁহার মধ্যে বৌদ্ধদের প্রভাব দেখা যায়। বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিতে গিয়া তিনি দিঙ্‌নাগের মতকেই খণ্ডন করিয়াছিলেন। দিঙ্‌নাগ বলিয়াছিলেন, অন্তরে যাহা জ্ঞেয়রূপে প্রতিভাত হয় তাহাই যেন বাহিরের জগতে রহিয়াছে এইরূপ মনে হয়, কিন্তু দিঙ্‌নাগই একমাত্র বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদীই নহে। বিজ্ঞানই যে বহির্লোকে নানা আকারে আপনাকে দেখাইতেছে এই মতের বিজ্ঞান-বাদীদের বিরুদ্ধে শঙ্করাচার্য্যের প্রায় কিছুই বলিবার ছিল না। সাংখ্য এবং যোগ ইহারা উভয়েই জগৎকে দুঃখময় বলিয়া জানিতেন, সাংখ্য বলিতেন "দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ

জিজ্ঞাসা, তদবঘাতকে হেতৌ", অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের দ্বারা আক্রান্ত ইহা বলিয়াই আমরা কি করিয়া দুঃখ দূর করিতে পারি এই বিষয়ে প্রশ্ন করি। বুদ্ধের মনেও এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। যোগ বলিতেছেন "অক্ষিপাত্রকল্পোহি বিদ্বান" অর্থাৎ আমাদের অন্য অঙ্গে সামান্য ধূলাবালি লাগিলে আমরা বুঝিতে পারি না, কিন্তু চক্ষুর মধ্যে সামান্য একটু কিছু গেলেই আমরা আর্ত্ত হইয়া উঠি। বিদ্বান্ ব্যক্তিও তেমনি জগতে যাহা অন্য লোকে সুখকর মনে করে, তাহার মধ্যে দুঃখের রূপকে দেখিয়া আর্ত্ত হইয়া ওঠে। মনে করে কেমন করিয়া এই দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইব। এমনিভাবে দেখা গেলে যোগের বহুমত যে বৌদ্ধমতের দ্বারা প্রভাবিত তাহা অনায়াসেই বোঝা যায়। সাংখ্য মতের পুরুষ না মানিলে ফলতঃ বৌদ্ধমতের সহিত পার্থক্য অতি কমই থাকে এমনি করিয়া আস্তিক ও অনাস্তিক মত পরস্পরের সহিত বিরোধে ও পরস্পরের প্রভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

দ্বাদশ শতক হইতে বৌদ্ধমত ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হয় এবং বহু বৌদ্ধ পুনরায় আস্তিক মত আশ্রয় করিয়া আপনাদের বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলে। বৌদ্ধেরা যে সন্ন্যাসী-দল সৃষ্টি করিয়াছিলেন শঙ্করাচার্য্য সেই অনুসারে দশনামী

সন্ন্যাসীদল সৃষ্টি করেন। অপরাপর মতের মধ্যেও এই সন্ন্যাসের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। দ্বাদশ শতকের পর হইতে ভারতীয় দর্শন দুইটী শাখায় আপনাকে প্রকাশ করে, একটী শাখা তর্ক শাখা এবং অপরটী ভক্তি শাখা। এই সময় হইতে নব্যন্যায়ের প্রভাবে প্রায় সমস্ত দর্শনের মধ্যেই প্রমেয় বস্তু সম্বন্ধে বিচার একরূপ নিরুদ্ধ হইয়া গিয়া যুক্তি তর্ক অত্যন্ত প্রবল হইয়া ওঠে। নব্যন্যায়ের প্রধান চেষ্টাই ছিল এমন একটী ভাষা আবিষ্কার করা যাহা দ্বারা অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে, নির্দ্দোষ ভাবে যাহা বক্তব্য তাহা যাহাতে প্রকাশ করা যায়। এই ভাষাকে অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তীকালে নানা দর্শনের নানা টীকা গ্রন্থ লেখা হয়। ইহাতে দর্শনের মূল রস শুকাইয়া গিয়া তর্ক জিঘাংসা প্রবল হইয়া ওঠে। অপর দিকে দক্ষিণ দেশে রামানুজ মত, ভাগবৎ, মধ্ব মত, বল্লভ মত, নিম্বার্ক মত প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া প্রাচীন জ্ঞান সাধনাকে ও দার্শনিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ভক্তির প্লাবন বহাইয়া দেয়, বাংলাদেশে এই প্লাবনের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ জন্মিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্য।

মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় তৃতীয় শতক হইতেই চীনভাষায় অনুদিত হইতে আরম্ভ করে। এই সমস্ত মূল গ্রন্থগুলির অধিকাংশই বিলুপ্ত। অনেকগুলি বা

চীন ভাষায় অনূদিত অবস্থায় রহিয়াছে। এইগুলি সকলের পাঠযোগ্য হইতে এখনও দীর্ঘকাল লাগিবে, হয়ত শত-বৎসরেও হয় কিনা সন্দেহ। পরবর্ত্তী কালে অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। এমনি করিয়া এই বৌদ্ধ ধর্ম্ম শুধু তিব্বত, চীন, তুরফান, তুর্কীস্থান প্রভৃতি দেশেই যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল তাহা নহে, কম্বোজ, জাপান, শ্যাম, যব প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরীর দ্বীপপুঞ্জ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং শিল্পে ও কথায় ভারতবর্ষে ও অন্য প্রদেশে একটা নব অভ্যুদয় ও নব জাগরণ আনিয়াছিল।

বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা বুঝা যাইবে যে এই ধর্ম্ম যে দর্শনের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে তাহার যুক্তি তর্ক অত্যন্ত সূক্ষ্ম। সাধারণ লোকের তাহা সহসা বুঝিয়া আয়ত্ত করিবার কথা নহে। বৌদ্ধ দর্শনের দার্শনিক মার্গ হইতে অনেকেই বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। ইহা হইতেই খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক হইতেই বৌদ্ধ তন্ত্রগুলির আবির্ভাব হয়। বৌদ্ধ ক্ষান্তি পারমিতা, দান পারমিতা প্রভৃতি এবং অন্যান্য বৌদ্ধ নানা তত্ত্ব দেবদেবীরূপে কল্পিত হইয়া নানা রূপ পূজা অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। নানা রূপ বীজ মন্ত্রেরও কল্পনা করা হয়। এই সব বীজ মন্ত্রগুলিকে ধারিণী বলা হইত। লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি

দেবী বোধ হয় প্রথমতঃ বৌদ্ধ কল্পনা হইতেই সৃষ্ট হয়। এই বৌদ্ধ তন্ত্র হইতেই স্ত্রীপুরুষকে অবলম্বন করিয়া নানা রূপ সাধন পদ্ধতির সৃষ্টি হয়। তিব্বতীয় বৌদ্ধ আগমগুলির মধ্যে ইহাদের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুর দেবদেবী বলিয়া অনেক বৌদ্ধ দেবদেবী হিন্দু পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে এবং এই বৌদ্ধ তন্ত্রগুলির অনেক সময় হিন্দু তন্ত্রগুলির সহিত মিশিয়া নূতন নূতন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে।

মহাযান বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত অদ্বৈতমত ও যোগশাস্ত্রকে অবলম্বন কবিয়া বৌদ্ধ তন্ত্রগুলি লিখিত হয়। বহু প্রাচীন কাল হইতে এদেশে যোগাভ্যাস চলিত। এমন কি খৃঃ পূঃ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে, মহেঞ্জোদারোতে একটী মূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে সেই মূর্ত্তির চক্ষুটী তাহার নাসিকার অগ্রভাগে নিবদ্ধ। ইহা দেখিয়া অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, ইহা যোগাভ্যাসেরই একটী মূর্ত্তি। বুদ্ধ নিজে যোগাভ্যাসের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন এবং সমাধির দ্বারা যে প্রজ্ঞা লাভ করা যায় এবং সেই প্রজ্ঞার দ্বারাই যে নির্ব্বাণ লাভ হয় একথা বলিয়া গিয়াছেন। মহাযান শাস্ত্রে যাঁহারা বোধিসত্ত্বের মার্গ অবলম্বন করিতেন, তাঁহারা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া নামিতেন যে আমাদের জীবন

আমরা সর্ব্বভূতের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিব। জন্ম হইতে জন্মান্তরে তাঁহারা এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে সর্ব্বভূতের মঙ্গলে ব্যাপৃত থাকিতেন। এই অবস্থায় বোধিসত্ত্বের নানা প্রাণীর মধ্যে জন্ম হইত। নানা প্রাণীরূপে জন্মলাভ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা স্মরণ রাখিতেন এবং প্রতি জন্মেই তাঁহারা পরের উপকার করিতে ব্যস্ত থাকিতেন। এমনি করিতে করিতে চরম জন্মে তাঁহারা যম নিয়মাদির অভ্যাস করিয়া, চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া সমাধির দ্বারা প্রজ্ঞা লাভ করিতেন, কিন্তু নির্ব্বাণে প্রবেশ করিতেন না। যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের মঙ্গল না হয় সে পর্য্যন্ত তাঁহারা নিজেদের চরম মঙ্গল চাহিতেন না। জাতক-গুলির মধ্যে বুদ্ধ তাঁহার বোধিসত্ত্ব রূপে জীবন আরম্ভ করার পর হইতে নানা প্রাণী জীবনের মধ্যে থাকিয়াও কি ভাবে পরোপকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে বর্ত্তমান বুদ্ধজন্মে চিত্তকে সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধ করিয়া, সমাধি অবলম্বন করিয়া প্রজ্ঞালাভ করেন। মহাযানীরা বলেন যে তিনি এখনও নির্ব্বাণে প্রবেশ করেন নাই এবং সর্ব্বভূতের নির্ব্বাণ পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার দ্বারা জগতের মঙ্গল করিতে চেষ্টা করিবেন। বোধিসত্ত্বেরা কীভাবে পরের

উপকার করিতে চেষ্টা করিতেন তাহা অবদান কাহিনী-গুলিতে বর্ণিত আছে। পতঞ্জলির যোগসূত্র এবং ব্যাস-ভাষ্য দেখিলে মনে হয় যে তিনি বৌদ্ধ যোগশাস্ত্রের মতকে সাংখ্য সিদ্ধান্ত অনুসারে নূতন করিয়া গড়িয়াছিলেন। যোগসূত্রের পূর্ব্বে আস্তিক মতে যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিত পাওয়া যায় না। গীতার মধ্যে যে যোগ শব্দের উল্লেখ আছে তাহা সম্ভবতঃ কোনো বিষয়ে চিত্তকে নিবিষ্ট করা অর্থে ব্যবহৃত। সেখানে যোগ অর্থে দুইটী জিনিষকে একত্র করা। "যুজির্‌যোগে", এই যুজির ধাতু হইতে সেই যোগশব্দ নিষ্পন্ন। পতঞ্জলির যোগসূত্রে যে যোগশব্দ আছে তাহা চিত্তবৃত্তির নিরোধ অর্থে ব্যবহৃত। পরিণামে বা সর্ব্বশেষে যে নিরোধ সমাধি ঘটে তখন কোনো বস্তুর উপরই চিত্ত সংযুক্ত থাকে না। চিত্তবৃত্তি তখন অন্ধ হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের ধ্বংস হয়। যদি যোগদর্শনে পুরুষ বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু না মানা হইত তবে এই চিত্ত-ধ্বংস অবস্থা হইতে নির্ব্বাণ অবস্থাকে পৃথক করা কঠিন হইত। এমনি করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ যোগের মধ্যে একটী সুন্দর সঙ্গতি ছিল। পরবর্ত্তী বৌদ্ধ ও হিন্দুমতে যখন নানা দেবদেবীর কল্পনা হইল, তখন সাংখ্য ও অদ্বৈত মতকে মিশাইয়া ও তাহার

সহিত যোগের উপায়কে সংযুক্ত করিয়া, একটী নূতন রকমের সাধনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল। ইহাই সাধারণতঃ তন্ত্র নামে অভিহিত। 'তন্' ধাতুর অর্থ 'বিস্তার', এইজন্য সাধারণভাবে 'তন্ত্র' বলিতে 'বিস্তৃতি সাহিত্য' বোঝায়। এই হিসাবেই ইহা মন্ত্র বা সূত্র হইতে ভিন্ন। এইজন্য চিকিৎসা তন্ত্র, জ্যোতিষ তন্ত্র এইসব স্থলেও তন্ত্র শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। আমাদের বাংলা দেশে যে তন্ত্র প্রচলিত আছে তাহা প্রধানতঃ শক্তি উপাসনার তন্ত্র। বহুপূর্ব্ব হইতেই শক্তি যে বাক্যরূপে, জগৎরূপে, আপনাকে নিয়ত পরিবর্ত্তিত করিতেছে, এই মতটী ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিশেষতঃ ভর্ত্তৃহরির বাক্যপদীয়ে প্রচলিত ছিল। মায়াকে ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া বলা হইত। এই মতটী বৈষ্ণব তন্ত্রের মধ্যে এবং বৈষ্ণব দর্শনে ঈশ্বর ও তাঁহার শক্তি এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অনেক পুরাণে প্রকৃতিকে মায়ার স্বরূপ বলিয়া বলা হইয়াছে। প্রকৃতির পরিণামে যেমন জগৎ, মায়ার পরিণামেও তেমনি জগৎ। তাই প্রকৃতি এবং মায়া এক। এই প্রকৃতিই শক্তিরূপিনী এবং সেইজন্য দেবী পার্ব্বতীর সহিত অভিন্ন। কালী তারা প্রভৃতিও এই পার্ব্বতীরই রূপ। মায়া যেমন ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া আছে এবং মায়া প্রকাশের বিষয় যেমন ব্রহ্ম, তেমনি শিবকে অবলম্বন

করিয়াই আছেন শক্তি। শিব শক্তি উভয়ের সম্মিলনে ঘটিয়াছে এই সৃষ্টি। এই মতের সহিত একদিকে যুক্ত হইল প্রাণায়াম ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি এবং অপরদিকে নানারূপ পূজা অর্চ্চনা। নিরাকার মনোভাব হইতে যেমন মনের মধ্যে অর্থ উদিত হয় এবং পরিশেষে সেই অর্থ বাক্যাকারে পরিণত হয় তেমনি শিবশক্তির নিরাকার স্বরূপ হইতে এই আকারময় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। এই রকম উপমা বা analogy হইতে সংস্কৃত বর্ণমালার প্রত্যেকটী অক্ষর একটী শক্তির ব্যঞ্জক বলিয়া মনে করা হইত। ইহার সহিত আবার যুক্ত হইল একটা নূতন ধরণের দেহতত্ত্ব, কল্পনা হইল যে মেরুদণ্ডের নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া মাথা পর্য্যন্ত ছয়টী নাড়ীচক্র আছে। এই প্রত্যেক চক্রে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শক্তি, আমাদের নানা-প্রকার মনোবৃত্তির, রাগদ্বেষাদির ইহারাই উৎপাদিকা এবং সেই সেই বিশেষ শক্তির symbol বা প্রতীক স্বরূপে বর্ণমালার এক একটী অক্ষর বীজমন্ত্ররূপে গৃহীত হইল। সেই সেই নাড়ীচক্রে, চিত্তকে সমাহিত করিলে নিজের মধ্যে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা সেই সেই নাড়ীচক্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিবিধ শক্তিকে জয় করা যায়। এমনি করিয়া ছয়টী চক্রের বিবিধ শক্তি জয় করিলে আমরা আত্মজয়ী

হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারি, ইহাই মোটামুটিভাবে তন্ত্রজাতীয় সাহিত্যের শিক্ষা। স্ত্রী-পুরুষ লইয়াই জগতের সৃষ্টি, এই কল্পনা করিয়া, স্ত্রীপুরুষ ঘটিত একটা নূতন রকমের সাধন পদ্ধতিও বৌদ্ধতন্ত্রে এবং হিন্দুতন্ত্রে প্রবেশ করিয়াছিল।

উপনিষদে লিখিত আছে যে প্রণয়িনীকে আলিঙ্গন করার আনন্দের তুল্য ব্রহ্ম প্রাপ্তির আনন্দ; সকল আনন্দের মূল স্থান জননেন্দ্রিয় এবং আনন্দ হইতেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ঘটিতেছে। এই সমস্ত বাক্যের অর্থকে নানাপ্রকারে অবলম্বন করিয়া এই মতের সাধকেরা আপন মত দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়-লালসা বর্জ্জিত স্ত্রীপুরুষের প্রেমই যে চরমপ্রাপ্তিকে আনয়ন করে এরকম মতও বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখা যায়। কৃষ্ণ ও রাধার প্রেম এই প্রেমের আদর্শ। এই প্রেমে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই এমনভাবে মিলিত হয় যে তাহাতে দ্বৈতবোধ বিনষ্ট হইয়া যায়—স্ত্রীপুরুষ বোধ থাকে না, উভয়ে মিলিয়া একটী অখণ্ড রসাস্বাদ প্রকাশিত হয়।

শাক্ত তন্ত্রগুলি অধিকাংশই অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্যমতের মধ্যে ঈশ্বর মানিয়া যোগশাস্ত্র যে দার্শনিক প্রক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার সাহায্য

লইয়া অনেক পুরাণে এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রে ঈশ্বরকে প্রকৃতি ও পুরুষের সম্মেলনের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিজ্ঞান ভিক্ষু ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্য করেন। এই ভাষ্যে তিনি ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করেন যে ঈশ্বর সৃষ্টিকালে প্রকৃতিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া প্রকৃতির সৃষ্টি প্রক্রিয়া আরম্ভ করেন এবং তাঁহারই ইচ্ছায় প্রকৃতি ও পুরুষ মিলিত হয়, এবং প্রকৃতি পুরুষের প্রয়োজন অনুসারে সৃষ্টি করেন। পুরাণগুলির মধ্যে দেখা যায় যে কতকগুলিতে সাংখ্য যোগ মতেই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলিতে বা প্রকৃতি পুরুষের সহিত ঈশ্বর স্বতন্ত্রভাবে বলা হইয়াছে। কতকগুলিতে বা অদ্বৈতমতই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। আবার এই অদ্বৈত ও দ্বৈত মতকে অবলম্বন করিয়া শৈব দর্শনের বিভিন্ন শাখা, বিভিন্ন প্রস্থানের শৈব দর্শনরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কাশ্মীরের প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন খৃষ্টীয় সপ্তম, অষ্টম শতাব্দী হইতেই প্রসিদ্ধিলাভ করে। এই দর্শনে প্রধান প্রতিপাদ্য এই যে ঈশ্বর জ্ঞান এবং ইচ্ছার স্বরূপ। এই জগৎ তাঁহারই শক্তিতে, তাঁহারই প্রতিবিম্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে এবং আমরা সকলে তাঁহারই প্রতিবিম্বস্বরূপ। আমরা যে তিনিই এবং তিনিই যে আমরা ইহা চিনিতে পারিলেই মুক্তি। প্রত্যভিজ্ঞা অর্থ চেনা।

অভিনব গুপ্ত, বসু গুপ্ত প্রভৃতি বহু দার্শনিকেরা এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। Kashmir Series-এ এই সম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা প্রচারিত শৈব দর্শন একরূপ অদ্বৈত দর্শনেরই নামান্তর। আবার বীরশৈব মতের শৈবদর্শন শক্তি বিশিষ্ট ব্রহ্ম মানিয়া অনেকটা রামানুজের মতই অবলম্বন করিয়াছে। আবার নকুলিশ পাশুপত মত ঈশ্বরকে একান্ত স্বতন্ত্র বলিয়া মানিয়াছেন। কর্ম্ম এবং কর্ম্মফলকে অপেক্ষা না করিয়াই, ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া থাকেন। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সম্পন্ন হইলে, ঈশ্বর মুক্তি বিধান করেন। মাণিক্য বা সগর প্রভৃতির গ্রন্থে যে সমস্ত ভক্তির স্তোত্র পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে ঈশ্বর প্রভু এবং আমরা তাঁহার দাস, এই মনোভাব অত্যন্ত সুন্দররূপে ফুটিয়াছে। এইভাবে ভারতীয় দর্শন নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া শুধু দর্শনরূপে পরিস্ফুট হয় নাই কিন্তু ধর্ম্মরূপ সকলের উপজীব্য হইয়াছে।

ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে যদিও আস্তিক ও নাস্তিক দর্শনে এবং আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যেও মতের নানারূপ প্রভেদ দেখা যায় তথাপি একটী বিষয়ে (চার্ব্বাক ছাড়া) আর প্রায় সকলেই

এক মত। দর্শনশাস্ত্রকে কেবল যুক্তির তর্কের কৌশল বলিয়া কেহ মনে করিতেন না। সমস্ত দর্শনেরই একটী অখণ্ড উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে প্রভেদ দেখা যায় সেইটীই কেবলমাত্র ভঙ্গীর পার্থক্য। কেহ বলিতেন একান্ত ভাবে এবং অত্যন্ত ভাবে দুঃখ দূর করাই দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। একান্ত শব্দের অর্থ সুনিশ্চিত, অর্থাৎ যে উপায়ে দুঃখ দূর হইবেই। অত্যন্ত অর্থ যে উপায়ে দুঃখ দূর হইলে, পুনরায় আর দুঃখ হইবে না। বৌদ্ধ, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়-বৈশেষিক ও মীমাংসা বলেন যে এই ভাবে সম্পূর্ণ রূপে সমূলে দুঃখ উৎপাটন করিবার জন্যই দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন। অদ্বৈত বেদান্তী বলেন যে উপনিষদের বাক্য অনুসরণ করিয়া জ্ঞানের দ্বারা যথার্থ পরমার্থ সত্য বুঝিতে পারিলে সমস্ত ভ্রম দূর হয় এবং পরমানন্দ স্বরূপে বিশ্রাম লাভ করা যায়। জৈনেরা বলেন যে মুক্তি হইলে আমাদের যে যথার্থ স্বরূপ আমরা যে অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত দর্শন, অনন্ত বীর্য্য সম্পন্ন সুখ স্বরূপ, ইহা উপলব্ধি করিয়া, জাগতিক সমস্ত আবরণ ও দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করি। বস্তুতঃ আস্তিকবাদীরা ঈশ্বর বলিতে যাহা বোঝেন তাহা নাই। আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বর। যে শক্তি কেবলমাত্র ঈশ্বরের আছে বলিয়া লোকে মনে করে সে শক্তি

আমাদের সকলেরই আছে, কেবলমাত্র, কর্ম্ম ও ক্লেশের আবরণের দ্বারা আমরা জড়িত থাকি বলিয়া আমাদের স্বাভাবিক স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারি না। এই সমস্ত আবরণ দূর হইয়া গেলে আমরা মুক্ত রূপে আলোক আকাশে নিশ্চল হইয়া থাকিতে পারি। বৈষ্ণবেরা কোনো না কোনো ভাবে, ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য বা পৃথক্ত্বো স্বীকার করেন এবং বলেন যে আমাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে এবং শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তিনিই আমাদের কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত করেন, তখন তাঁহার সান্নিধ্যে আমরা বিমল আনন্দ অনুভব করিতে পারি। বৈষ্ণবদের অনেকেই মুক্ত ব্যক্তির মধ্যেও যে অবস্থার তারতম্য আছে এবং কেহ যে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত এবং কেহ যে একটু কম অনুগৃহীত একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন বৈষ্ণবদের মধ্যে কিছু কিছু মতানৈক্য আছে, আবার নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকেরা বলেন যে কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইলে আমাদের আত্মা স্ব স্বভাবে একেবারে নিগুর্ণ অবস্থায় থাকে। মুক্ত আত্মার কোনো জ্ঞান নাই, কোনো সুখ দুঃখ বোধ নাই, কর্ম্ম নাই, ইচ্ছা নাই। তাহারা পাষাণ-বৎ নিশ্চল ও নিগুর্ণ হইয়া থাকেন, আবার সাংখ্য যোগ মতে, আত্মা চৈতন্য স্বরূপ। সুখ দুঃখ প্রকৃতির ধর্ম্ম, বুদ্ধির

ধর্ম্ম। মুক্ত অবস্থায় পুরুষের সহিত প্রকৃতির বা বুদ্ধির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক একান্ত ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সুখ দুঃখ প্রকৃতি বা বুদ্ধির ধর্ম্ম। এইজন্য এই কৈবল্য অবস্থায় অর্থাৎ যখন পুরুষ কেবল একলাই থাকেন, প্রকৃতি বা বুদ্ধির সহিত তাহার সমস্ত সম্পর্ক যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তখন সেই পুরুষ কেবল আপন চিৎ স্বরূপে অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপে অবস্থান করেন। তাঁহার কোনো সুখ দুঃখ বোধ থাকে না, কর্ম্ম থাকে না, ইচ্ছা থাকে না। আবার বৌদ্ধেরা বলেন যে আত্মা বা পুরুষ বলিয়া যাহা মনে হয় তাহা ভ্রম মাত্র। অবিদ্যা তৃষ্ণা, কর্ম্ম প্রভৃতির ফলে আমাদের ভিতরে নানা চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হয় এবং বাহিরের জগতের রূপ রসাদি উৎপন্ন হয় এবং আমাদের মনে হয় যেন আমাদের মধ্যে কোনো একটা আমি বা আত্মা রহিয়াছে। যখন অবিদ্যা তৃষ্ণা, কর্ম্ম প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া যায় তখন এই আমিত্ব বোধ আর থাকে না, এবং এই আমিত্বকে অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত অনুভব ও প্রতীতী উৎপন্ন হইতেছিল তাহাও বিনষ্ট হয়। একটী আমি-কে অবলম্বন করিয়া জন্ম হইতে জন্মান্তরে যে প্রতীতীর ধারা প্রদীপ শিখার ন্যায় চলিয়া আসিতেছিল তাহা বিনষ্ট হয়। এই অবস্থাকে বলে নির্ব্বাণ। আবার কোনো কোনো

বৌদ্ধেরা বলেন যে জগতের মূল তত্ত্ব সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তাহাকেই অবলম্বন করিয়া আলয়-বিজ্ঞান রূপে একটী বুদ্ধিতত্ত্ব প্রকাশিত হয় এবং তাহাই অবিদ্যা প্রভৃতির দ্বারা আন্দোলিত হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি ধারা উৎপন্ন হয় এবং কোনো একটী ধারার নির্ব্বাণ হইলে সেই ধারায় আর সুখ দুঃখ প্রভৃতির কোনো অনুভব থাকে না। সেই ধারাটী একেবারে বিলুপ্ত বা বিনষ্ট হইয়া যায়। নির্ব্বাণ মুক্তি, অপবর্গ, মোক্ষ বা কৈবল্য প্রভৃতি শব্দের দ্বারা বিভিন্ন দর্শনের একটী চরম অবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই চরম অবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধে দর্শনে দর্শনে কিছু কিছু মত-ভেদ থাকিলেও সেই চরম অবস্থা প্রাপ্তির জন্যই যে আমা-দিগকে দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে হইবে একথা সকলেই স্বীকার করেন। বৈষ্ণবেরা শুধু তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি হয় একথা মানেন না। ঈশ্বরের করুণা বা কৃপা একান্ত আবশ্যক। এই করুণা পাইতে হইলে তাঁহার শরণাগত হইতে হয়। এই শরণাগতির দার্শনিক নাম প্রপত্তি। তত্ত্বজ্ঞান না হইলে এবং চিত্ত নির্ম্মল না হইলে, ঈশ্বর কাহাকেও অনুগ্রহ করেন নাই, ইহাই সাধারণ নিয়ম। তবে অনেক বৈষ্ণব এবং শৈবেরাই একথা বলেন যে ঈশ্বর স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন। কর্ম্ম ও কর্ম্মের নিয়মের দ্বারা তিনি

বাধ্য নহেন। তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি মহাপাপীকেও কর্ম্মফল হইতে মুক্তি দিতে পারেন।

চার্ব্বাক ছাড়া আস্তিক ও নাস্তিক সকল দর্শনেই একথা মানা হয় যে কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। অনেকে বলেন যে আমরা অনাদিকাল হইতে নানারূপ কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি। এই সমস্ত কর্ম্ম জমা হইয়া রহিয়াছে, তাহার কতকগুলি যখন ফল দেওয়ার উপযুক্ত হয় তখন যে রকম দেহে সেই ফল ভোগ করা যায় সেই রকম দেহে আমাদের জন্ম হয়। যতদিন সেইরূপ ফল ভোগ করা আবশ্যক, ততদিন সেই দেহের আয়ু থাকে এবং সেই কর্ম্ম অনুসারে আমাদের সুখ দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। আমরা কেবল মনুষ্য দেহেই কর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া থাকি। দেব দেহে বা পশু দেহে কেবল সুখ দুঃখ অনুভব করা যায়। কিন্তু কোনো কর্ম্মের দায়ীত্ব থাকে না। সেই জন্য সেই সেই দেহে কর্ম্ম সঞ্চিত হয় না। যে কর্ম্মগুলি ফলোন্মুখী হইয়া কোনো বিশেষ দেহে জন্ম, আয়ু ও সুখ দুঃখাদির ব্যবস্থা করে তাহাকে বলে প্রারব্ধ কর্ম্ম, আর যে কর্ম্মগুলি এখনও জমিয়াই আছে কিন্তু ফল দেওয়ার উপযুক্ত হয় নাই তাহাকে বলে অনারব্ধ কর্ম্ম। রাগ, দ্বেষ, অহংকার এবং নিজের জন্য মমতা এই

গুলিকেই বলে ক্লেশ। এই ক্লেশের বশবর্ত্তী হইয়াই আমরা কর্ম্ম করিয়া থাকি, এবং ক্লেশ আছে বলিয়াই কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকি। অধিকাংশ দার্শনিকদের মতে শুধু কর্ম্ম মাত্রেই কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয় না। ক্লেশ আছে বলিয়াই কর্ম্মফল ভোগ করি, এইজন্য গীতায়, নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলেই চিত্ত-বিশুদ্ধি ঘটিতে পারে। এইরূপ চিত্ত-বিশুদ্ধি না ঘটিলে যথার্থ তত্ত্ব-জ্ঞান হয় না, কারণ যে জ্ঞান আমাদের রাগদ্বেষ দূর করিতে না পারে এবং আমাদের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারে সেই জ্ঞানকে যথার্থ ভাবে তত্ত্বজ্ঞান বলা যায় না। এইজন্য শুধু দার্শনিক জ্ঞান দ্বারা যে মুক্তি হয় না ইহা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। এইজন্য চিত্তকে পরিষ্কার না করিতে পারিলে, চিত্তকে মলিনতা বর্জ্জিত না করিতে পারিলে যথার্থ ভাবে তত্ত্বজ্ঞান হয় না। এর চরিত্র শোধন এবং যোগাভ্যাস বা ঈশ্বরের শরণাগত হওয়া। ইহাছাড়া তত্ত্বজ্ঞানও উৎপন্ন হয় না বা ঈশ্বরেরও অনুগ্রহ সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। ইয়োরোপীয় Moral Science-এ কৃত কর্ম্মেরই দোষগুণ বলা হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতীয় মতে কর্ম্ম শুধু কায়িক নহে, ইহা বাচিকও

মানসিকও বটে। মানসিক নির্ম্মলতা না হইলে কায়িক ও বাচিক দুঃষ্কর্ম্ম হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। ইয়োরোপীয় Moral Science শুধুমাত্র social অর্থাৎ 'মনুষ্য সমাজের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু ভারতীয় মতে সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি রাগদ্বেষ মজুত হওয়া আবশ্যক। সমস্ত প্রাণী-সমাজই আমাদের সমাজ, কেবল মনুষ্য সমাজই নহে, এইজন্য মোক্ষকামীরা সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি অহিংসা আচরণ করিতে বাধ্য। সাধুকর্ম্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা মনকে রাগদ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত না করিতে পারিলে এবং সাধু চিন্তা দ্বারা মন হইতে সমস্ত অপরাধের বীজ দূর করিতে না পারিলে যোগাভ্যাসও হয় না, তত্ত্বজ্ঞানও হয় না, এবং ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিও করা যায় না। এইজন্য এই বিষয়ে চার্ব্বাক ছাড়া আস্তিক ও নাস্তিক সকল দর্শনেরই ঐক্য আছে। সকল দর্শনেরই উদ্দেশ্য কর্ম্ম বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা।

জগতে কী কী বস্তু আছে; কেমন করিয়া তাহা উৎপন্ন হইয়াছে; আত্মা আছে কি নাই; থাকিলে তাহা কীরূপ; আমাদের জ্ঞান কী করিয়া হয়; জাগতিক বস্তু ক্ষণস্থায়ী, না মিথ্যা, না সত্য না ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনশীল, না তাহাদের কোনো অংশ স্থির থাকে, কোনো অংশে

'পুরাতন গুণ বিনষ্ট হয় এবং নূতন গুণ আবির্ভূত হয়; বাহিরের বস্তু শুধু জ্ঞানেরই আকার না একেবারে নিঃস্ব ভাব না ভ্রম মাত্র, না সত্য, না সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভ্রম মাত্র, এই সমস্ত সম্বন্ধে, বা কী কী প্রমাণে আমরা জ্ঞান লাভ করি, তাহাদের স্বরূপ কী, সত্য নির্দ্ধারণের উপায় কী, এই সমস্ত সম্বন্ধে দর্শনে দর্শনে অনেক মতভেদ থাকিলেও আমাদের চরম কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, আমাদের জীবনে কীরূপ আচরণ করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে দর্শনশাস্ত্র হইতে আমরা কী পাইতে পারি এ বিষয়ে মোটামুটী সকল দর্শনই প্রায় এক কথা বলিয়াছেন। খৃষ্টীয় একাদশ, দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ঈশ্বরের স্মরণ নেওয়া, তাঁহার প্রতি ভক্তি করা বৈষ্ণব ও শৈবদের মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। গীতার মধ্যেও এই ভক্তিবাদের উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু ভক্তিবাদে ঈশ্বরের প্রাধান্য স্বীকৃত হইলেও তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যকতা কিম্বা চিত্ত বিশুদ্ধির আবশ্যকতা কোন স্থলেই দুর্ব্বল করা হয় নাই। মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে বৈষ্ণবদের মধ্যে কিছু কিছু মতের পার্থক্য দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন নিরন্তর ঈশ্বরকে ধ্যান করাই ভক্তি, কেহ কেহ বলেন ঈশ্বর প্রভু, আমরা তাঁহার দাস এই ভাবে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করাই ভক্তি। কেহ কেহ

বলেন ঈশ্বরকে বন্ধুরূপে দেখাই ভক্তি। কেহ কেহ বলেন স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের ন্যায় ঈশ্বরের প্রতি গভীর অনুরাগই ভক্তি। বিভিন্ন সাধকেরা তাঁহাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগের বিচিত্র ব্যবহার দেখাইয়া গিয়াছেন। মধ্যযুগের সন্ত সাধকদের মধ্যেও অনেকে ভগবৎ প্রেমের নানা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। এমনি করিয়া ভারতীয় দর্শনের ধারা শুধু দার্শনিক পদ্ধতি হিসাবে চিন্তার গভীরতা দেখায় নাই, কিন্তু সকলেই একবাক্যে জীবনের সম্মুখে একটী চরম আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু একথা যেন কেহ মনে না করেন যে এই দর্শনের আদর্শ ও মোক্ষের আদর্শ সকলের সম্মুখেই উপস্থাপিত হইয়াছিল। যাঁহাদের বৈরাগ্য হইয়াছে, সংসারে যাঁহাদের বিরক্ত আসিয়াছে, যাঁহারা জন্ম, মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্তি চান, সেই মোক্ষকামীদের জন্যই এই দর্শনশাস্ত্রের আদর্শ। কিন্তু যাঁহারা গৃহস্থ, সংসারে যাঁহাদের বৈরাগ্য আসে নাই, যাঁহারা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন নাই, এই মোক্ষের আদর্শ তাঁহাদের জন্য নহে। তাঁহারা ইহার অধিকারী নহেন। তাঁহাদের পক্ষে জাতি বর্ণ অনুসারে ধর্ম্ম, অর্থ কামের অনুষ্ঠান করাই ছিল বিধি ও কর্ত্তব্য। এইজন্য তাঁহারা নানারূপ জ্ঞান আহরণ করিতে পারেন, এবং সেই

হিসাবে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি সকল বিষয়েরই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। চিত্তকে পরিষ্কার করিবার আবশ্যকতা সকলেরই আছে। অহিংসা বা সত্যবাদিতা সকলেরই অভ্যাস করা কর্ত্তব্য, কিন্তু সাংসারিক ব্যাপারে যাহারা সাংসারিক নানা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রহিয়াছে তাহারা অহিংসা প্রভৃতিকে অনুব্রত রূপে অর্থাৎ আপন আপন কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র অনুসারে পালন করিতে বাধ্য। যুদ্ধক্ষেত্রের যোদ্ধাকে হিংসা হইতে বিরত করা যায় না। গীতাকার এইজন্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, নিষ্কামভাবে যুদ্ধ কর। মহাভারতকার বলিয়াছেন যে পরের মঙ্গলের জন্য মিথ্যা বলিলে দোষ হয় না। যাহারা সাংসারিক নানা কার্য্যে লিপ্ত তাহারা মোক্ষ শাস্ত্রের সমস্ত উপদেশগুলি পূর্ণভাবে পালন করিতে পারে না, তথাপি তাহাদের নিকটে সেই আদর্শের একটী মূল্য আছে। জাগতিক জীবনে নিজের নিজের অবস্থা অনুসারে কর্ত্তব্য পালন করিয়া কী করিয়া মোক্ষের আদর্শকে জীবনে প্রতিবিম্বিত করিতে হয়, গীতাকার তাহা স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া গিয়াছেন। রঘুবংশে প্রথম সর্গে কালিদাস পর যে ছবিটী দিয়া গিয়াছেন তাহাতেও এই আদর্শের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। বাস্তব জীবনের

মধ্যেও বড় আদর্শকে একটু খাট করিয়া আনিয়া কেমন করিয়া জীবনের সহিত মিলাইতে হয় সেইটাই ছিল প্রাচীন গার্হস্থ্য জীবনের প্রধান আদর্শ। সাংসারিক ব্যক্তি রাগদ্বেষকে মোক্ষকামীর ন্যায় দূর করিতে পারেন না বটে, তথাপি রাগদ্বেষের আতিশয্য ও অস্থানে রাগ-দ্বেষের দ্বারা অভিভূত হওয়া যে কর্ত্তব্য নহে, ইহা প্রত্যেক সাংসারিক ব্যক্তিরই জানা আবশ্যক। মোক্ষ শাস্ত্রকে, যোগশাস্ত্রকে কেমন করিয়া স্বল্প মাত্রায় জীবনের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া সাংসারিক জীবনকেও মঙ্গলময় করিয়া তোলা যায় এইজন্য গৃহীর পক্ষে মোক্ষ-শাস্ত্র ও ভারতীয়-দর্শন আলোচনা করা আবশ্যক।